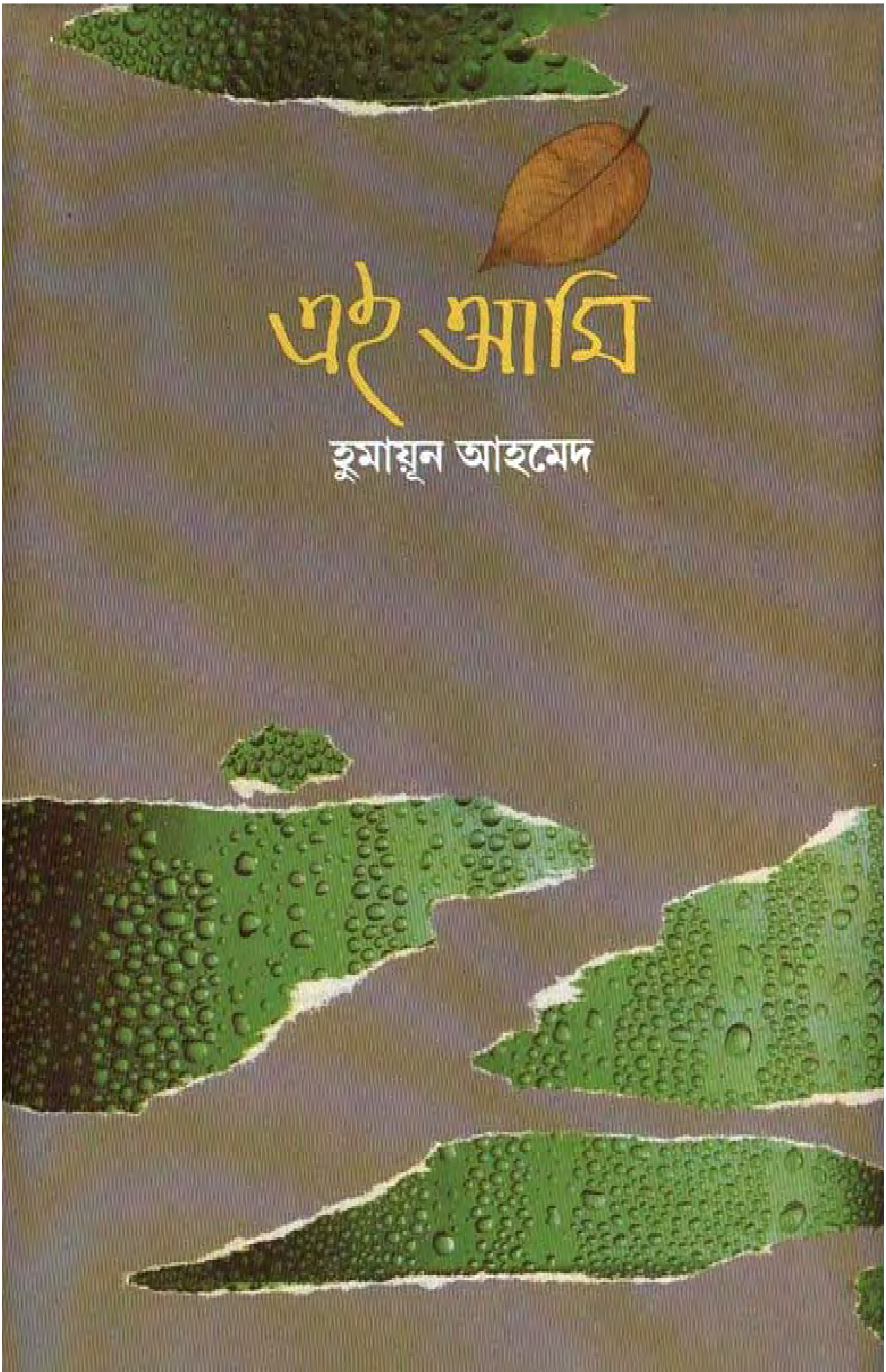
এই আমি
হুমায়ূন আহমেদ

©
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সপ্তম মুদ্রণ
ডিসেম্বর ২০০৬
প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৯৩

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

অক্ষর বিন্যাস
কম্পিউটার গ্যালাক্সি
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ৯০ টাকা

ISBN 984-437-036-1

উৎসর্গ

গাজী শামছুর রহমান

যিনি নিজে চোখ বন্ধ করে থাকেন

কিন্তু আশেপাশের সবাইকে বাধ্য করেন

চোখ খোলা রাখতে।

Listen to presences inside poems.
Let them take you where they will.

Follow those private hints,
and never leave the premises.

(জালালুদ্দিন রুমী)

ভূমিকা

ব্যক্তিগত রচনা শিরোনামে আমি এক ধরনের লেখা অনেক দিন থেকেই লিখছি। শুরু করেছিলাম 'হোটেল গ্রেভার ইন' দিয়ে। প্রকাশ করেছিল কাকলী প্রকাশনী। এই ধারার সর্বশেষ রচনা 'এই আমি'। এর প্রকাশকও কাকলী। যেখান থেকে শুরু সেখানেই শেষ। চক্র সম্পন্ন হল।

হুমায়ূন আহমেদ
১৩৫, এলিফেন্ট রোড
ঢাকা।

এই আমি	৯
চোখ	২১
পেট্রিফায়েড ফরেস্ট	২৭
উৎসব	৩৪
উমেশ	৩৬
সে	৪২
নারিকেল মামা	৪৮
পরীক্ষা	৫২
আমার বন্ধু সফিক	৫৫
মিসির আলি ও অন্যান্য	৬১
বর্ষাযাপন	৭২
ফ্রাংকেনস্টাইন	৭৭
চান্নিপসর রাইত	৮৩
লালচুল	৮৮

এই আমি

আমার বড় মেয়ে তার কলেজে একটা কোয়েশ্চেনীয়ার জমা দেবে। সেখানে অনেকগুলি প্রশ্নের ভেতর একটা প্রশ্ন হচ্ছে — 'তোমার প্রিয় ব্যক্তি কে?' সে লিখল, আমার মা।

আমি ভেবেছিলাম সে লিখবে — বাবা।

আমার সব সময় ধারণা ছিল আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে খুব পছন্দ করে। অন্তত তাদের মা'র চেয়ে বেশি তো বটেই। করারই কথা, আমি কখনো তাদের বকা-ঝকা করি না। অথচ তাদের মা এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছে —

'বাথরুম ভেজা কেন?'

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পড়তে বসনি। পড়তে বোস।'

'টুথপেস্টের মুখ লাগানো নেই, এর মানে কি?

'বন্ধুর সঙ্গে এতক্ষণ টেলিফোনে কথা কেন?'

'ফ্রকে ময়লা কি ভাবে লাগল?'

'মাছ তো গোটাটাই ফেলে দিলে। বোন-প্লেট থেকে তুলে এনে খাও। তোল বলছি। তোল।'

এই সব যন্ত্রণা আমি তাদের দেই না। খাবার টেবিলে আমি ওদের সঙ্গে মজার মজার গল্প করি। ভিডিও ক্লাবে কোন ভাল ছবি পাওয়া গেলে সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে দেখি। তারচেয়েও বড় কথা, এমন সব কাণ্ড-কারখানা মাঝে মাঝে করি যা বাচ্চাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করবেই। যেমন শহীদুল্লাহ্ হল-এ যখন থাকতাম তখন ভরা জোছনার রাতে বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে — পুকুরে গোসল করতে নিয়ে যেতাম। বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে সবাইকে নিয়ে পানিতে ভেজা তো আমার চিরকালের নিয়ম। সব সময় করছি। যে মানুষটি এমন সব কাণ্ড-কারখানা করে সে কেন প্রিয় হবে না? আমার বড় মেয়ের কোয়েশ্চেনীয়ার দেখে হঠাৎ করে আমার

মনে হল — আমি কি এদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি? যদি দূরে সরে গিয়ে থাকি তাহলে তা কখন ঘটল?

সারাদিন নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। ইউনিভার্সিটির কাজ, নাটকের কাজ, লেখার কাজ। এর ফাঁকে ফাঁকে লোক আসছে। প্রকাশকরা আসছেন লেখার তাগাদা নিয়ে। এসেই চলে যাচ্ছেন না, বসছেন, গল্প করছেন। চা খাচ্ছেন। নাটকে অভিনয় করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা আসছে। যে ভাবেই হোক তাদের টিভি নাটকে সুযোগ দিতে হবে। আমার গল্প-উপন্যাস পড়ে খুশি হয়েছে এমন লোকজন আসছে। খুশি হয়নি এমন লোকজন আসছে। আসছে পত্রিকা অফিসের মানুষ। কেউ বুঝতে পারছে না, আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত। আমার বিশ্রাম দরকার। নিরিবিলি দরকার। আমার অনেক দূরে কোথাও চলে যাওয়া দরকার। আমার সবটুকু সময় বাইরের লোকজন নিয়ে নিচ্ছে —। আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আমার স্ত্রীর জন্যে একটুও সময় আলাদা নেই।

একটা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি। সেই ছবির শ্যুটিং এর কারণে এক সপ্তাহের জন্যে বাইরে যেতে হল। যাবার আগ মুহূর্তেও লোকজন এসে উপস্থিত। তাদেরকে বিদেয় করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ট্রেন মিস করব। ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভারকে বললাম, খুব স্পীডে চালাও। ড্রাইভার উল্কার গতিবেগে ছুটল। আর তখন মনে হল, আসার সময় বিদেয় নিয়ে আসা হয়নি। বাচ্চারা হয়ত মনে মনে অপেক্ষা করছে, রওনা হবার আগে আমি বলব — বাবারা, যাই কেমন? সেটা বলা হয়নি। তারা দেখছে অসম্ভব ব্যস্ত এক মানুষকে। একে তারা হয়ত ভালমত চেনেও না। একজন অতি-চেনা মানুষ এম্নি করেই আস্তে আস্তে অচেনা হয়ে যায়। সম্ভবত আমিও অচেনা হয়ে গেছি। তবু ক্ষীণ আশা নিয়ে একদিন মেঝো মেয়েকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম। গলা নিচু করে কথা বলছি যেন অন্য কেউ কিছু শুনতে না পায়।

'কেমন আছ গো মা?'

'ভাল।'

'খুব ভাল, না মোটামুটি ভাল?'

'খুব ভাল।'

'এখন বল দেখি তোমার সবচে' প্রিয় মানুষ কে?'

'কোন প্রিয় মানুষ নেই বাবা।'

'না থাকলেও তো এমন মানুষ আছে যাদের তোমার ভাল লাগে। আছে না?'

'হুঁ — মা।'

'মা তোমার সবচে' প্রিয়?'

'হুঁ।'

'আর কেউ আছে?'

'আর ছোট চাচী।'

'আর কেউ?'

'শাহীন চাচা।'

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম লিস্ট লম্বা হচ্ছে — কিন্তু সেই দীর্ঘ লিস্টে আমার নাম নেই। আমাকে সে হিসেবের মধ্যেই আনছে না। এ রকম কেন হবে! দু'দিন আমি খুব চিন্তা করলাম। ভেবেছিলাম ব্যাপারটা নিজের মধ্যেই রাখব। আমার স্ত্রী গুলতেকিনকে জানাব না। এক রাতে তাকেও বললাম। সে বলল, কি অদ্ভুত কথা বলছ? বাচ্চারা তোমাকে অপছন্দ করবে কেন? তুমি ওদের খুবই প্রিয়।

'তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলছ?'

'মোটেই না —। আমার ধারণা তোমার মত ভাল বাবা কমই আছে।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ সত্যি। শীলার দুধ খাওয়ার ব্যাপারটা মনে কর। ক'জন বাবা এরকম করবে? শীলার দুধ খাওয়ার কথা মনে আছে?'

'আছে।'

আমার মেয়ের দুধ খাওয়ার গল্পটা বলি — তার কাছে এই পৃথিবীর সবচে' অপছন্দের খাবার হল দুধ। দুধের বদলে তাকে বিষ খেতে দেয়া হলেও সে হাসিমুখে খেয়ে ফেলবে। সেই ভয়াবহ পানীয় তাকে রোজ বিকেলে এক গ্লাস করে খেতে হয়। আমি আমার কন্যার কষ্ট দেখে, এক বিকেলে তার দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললাম। তাকে বললাম, মা'কে বলিস না আমি খেয়েছি। এরপর থেকে রোজ তার দুধ খেতে হয়। এক সময় নিজের কাছেও অসহ্য বোধ হল। তখন দু'জন মিলে যুক্তি করে বেসিনে ফেলে দিতে লাগলাম। বেশিদিন চালানো গেল না। ধরা পড়ে গেলাম।

বাবা হিসেবে আমি যা করেছি তা আদর্শ বাবার কাজ না। তবে শিশুদের পছন্দের বাবার কাজ তো বটেই। গুলতেকিন আমার কন্যার দুধের গল্প মনে করায় আমার উদ্বেগ দূর হল। আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়েই ঘুমুতে গেলাম। যাক, আমি খারাপ বাবা নই — একজন ভাল বাবা। তবু সন্দেহ যায় না।

পরদিন ছোটমেয়ে বিপাশাকে আইসক্রীম খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। সে বিস্মিত, তাকে একা নিয়ে যাচ্ছি। অন্য কাউকে নিচ্ছি না। ব্যাপারটা কি?

তাকে ডলসি ভিটায় কোন্ আইসক্রীম কিনে ফিস ফিস করে বললাম, আচ্ছা

মা বল তো, কাকে তোমার বেশি পছন্দ? তোমার মা'কে, না আমাকে?

সে মুখভর্তি আইসক্রীম নিয়ে বলল, তোমাকে।

তার বলার ভঙ্গি থেকে আমার সন্দেহ হল। আমি বললাম, তোমার মা শিখিয়ে দিয়েছে এরকম বলার জন্যে, তাই না?

'হুঁ।'

'সে আর কি বলেছে?'

'বলেছে — বাবা যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে কে সবচে' প্রিয় তাহলে আমার নাম বলবে না, তোমার বাবার নাম বলবে। না বললে সে মনে কষ্ট পাবে। লেখকদের মনে কষ্ট দিতে নেই।'

সত্যকে এড়ানো যায় না, পাশ কাটানো যায় না। সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়। আমি স্বীকার করে নিলাম। নিজেকে বুঝালাম — আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা যে কোন ব্যস্ত বাবার ক্ষেত্রেই ঘটবে। একদিন এই ব্যস্ত বাবা অবাক হয়ে দেখবেন এই সংসারে তাঁর কোন স্থান নেই। তিনি সংসারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। সংসারও তাঁর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এই এক আশ্চর্য খেলা।

এই খেলা আমাকে নিয়েও শুরু হয়েছে। আমি একা হতে শুরু হতে করেছি। বন্ধু-বান্ধব কখনোই তেমন ছিল না। এখন আরো নেই। যারা আসেন কাজ নিয়ে আসেন। কাজ শেষ হয়, সম্পর্কও ফিকে হতে শুরু করে। পুরানো বন্ধুদের কেউ কেউ আসেন — তখন হয়ত লিখতে বসেছি। লেখা ছেড়ে উঠে আসতে মায়া লাগছে। তবু এলাম। গল্প জমাতে পারছি না। সারাক্ষণ মাথায় ঘুরছে — এরা কখন যাবে? এরা কখন যাবে? এরা এখনো যাচ্ছে না কেন?

যে আন্তরিকতা, যে আবেগ নিয়ে তাঁরা এসেছেন আমি তা ফেরত দিতে পারলাম না। তাঁরা মন খারাপ করে চলে গেলেন। আমিও মন খারাপ করেই লিখতে বসলাম। কিন্তু সুর কেটে গেছে। লেখার সঙ্গে আর যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে না। যে চরিত্ররা হাতের কাছে ছিল তারা দূরে সরে গেছে। তবু তাদের আনতে চেষ্টা করছি — অনেক কষ্টে কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হল। ভাল লাগল না। ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ঘুমুতে গেলাম। মাথা দপ্ দপ্ করছে, ঘুম আসছে না। চা খেলে হয়ত ভাল লাগবে। গভীর রাতে কে চা বানিয়ে দেবে? রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই খুটখাট করছি — গুলতেকিন এসে দাঁড়াল। ঘুম-ঘুম চোখে বলল, তুমি বারান্দায় বস, আমি চা বানিয়ে আনছি।

সে শুধু আমার জন্যে চা আনল না, নিজের জন্যেও আনল। আটতলা ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে দু'জনে চুক্ চুক্ করে চা খাচ্ছি। আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করছি। আমার কারণে এত রাতে গুলতেকিনকে উঠতে হল। লজ্জা কাটানোর

জন্যে অকারণেই বললাম, চা খুব ভাল হয়েছে। একসেলেন্ট। সে কিছু বলল না।

আমি বললাম, একটা লেখা মাথায় চেপে বসে আছে, নামাতে পারছি না। কি করি বল তো?

সে হালকা গলায় বলল, লাঠি দিয়ে তোমার মাথায় একটা বাড়ি দেই, তাতে যদি নামে তো নামল। না নামলে কি আর করা।

আমরা দুজনই হেসে উঠলাম। এতে টেনশান খানিকটা কমল। আমি বললাম, গল্পটা কি শুনতে চাও?

'বল।'

আমি বুঝতে পারছি তার শোনার তেমন আগ্রহ নেই। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তারপরেও আমাকে খুশি করার জন্যে জেগে থাকা। আমি প্রবল উৎসাহে গল্পটা বলতে শুরু করেছি —

"মতি নামের একটা লোক। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। গ্রামের লোকজন মিলে ঠিক করেছে খেজুরের কাঁটা দিয়ে তার দু'টা চোখই উপড়ে ফেলা হবে।"

'মতির চোখ তোলা হবে কেন? সে কি করেছে?'

'এখনো ঠিক করিনি সে কি করেছে। তবে গ্রামবাসীর চোখে সে অপরাধী তো বটেই, নয়ত তার চোখ তোলা হবে কেন? তাকে ভয়ংকর কোন অপরাধী হিসেবে আমি দেখাতে চাই না। ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে দেখালে আমার পারপাস সার্ভড হবে না।'

'তোমার পারপাসটা কি?'

'চোখ তোলার ব্যাপারটা যে কি পরিমাণ অমানবিক সেটা তুলে ধরা। এমনভাবে গল্পটা লিখব যেন . . . যেন . . .'

'যেন কি?'

'তোমাকে ঠিক বুঝাতে পারছি না। মানে ব্যাপারই হল কি . . .'

গুলতেকিনকে বলতে বলতে গল্প লেখার আগ্রহ আবার বোধ করতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল, এক্ষুণি লিখে ফেলতে হবে। এক্ষুণি না লিখলে আর লিখতে পারব না। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে বারান্দায় বসে আছি। আকাশে এক ফালি চাঁদও আছে। বারান্দায় সুন্দর জোছনা। অথচ এই জোছনায় আমি গুলতেকিনকে দেখছি না। দেখছি তার জায়গায় মতি মিয়া বসে আছে। তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। সে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে বলছে — আমার ঘটনাটা লিখে ফেললে হয় না? কেন দেরি করছেন?

আমি ক্ষীণ গলায় ডাকলাম, গুলতেকিন!

'কি?'

'ইয়ে, তুমি কি আরেক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারবে?'

'শুবে না?'

'না, মানে ভাবছি গল্পটা শেষ করেই ঘুমুতে যাই।'

'সকালে লিখলে হয় না?'

'উহুঁ।'

সে উঠে চলে গেল। রান্নাঘরে বাতি জ্বলল।

কিছুদূর লিখলাম। না, ভাল হচ্ছে না। মতিকে আমি নিজে যে ভাবে দেখছি সেভাবে লিখতে পারছি না। নিজের উপর রাগ লাগছে, সেই সঙ্গে আশেপাশের সবার উপর রাগ লাগছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মনে হল, পৃথিবীর কুৎসিততম চায়ে চুমুক দিলাম। না হয়েছে লিকার, না হয়েছে মিষ্টি। নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, এটা কি বানিয়েছ?

ছোট ছেলে নুহাশের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভাঙলেই সে খানিকক্ষণ কাঁদে। সে কাঁদছে। আমি বিরক্ত হয়ে গুলতেকিনকে বললাম, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? কান্নাটা থামাও না।

গুলতেকিন কান্না থামাতে গেল। সে কান্না থামাতে পারছে না। কান্না আরো বাড়ছে। কাঁদতে কাঁদতেই নুহাশ দু'বার ডাকল। বাবা! বাবা! সে নতুন কথা শিখেছে। কি সুন্দর লাগে তার কথা!

আমার উচিত উঠে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে আদর করা। ইচ্ছা করছে না। বরং রাগে শরীর জ্বলছে। মনে হচ্ছে, এরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেন আমি লিখতে না পারি। আমি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত গলায় বললাম, সামান্য একটা কান্নাও থামাতে পারছ না! তুমি কি কর?

গুলতেকিন ছেলে কোলে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে যাচ্ছে। খোলা বারান্দায় খানিকক্ষণ হাঁটবে। নুহাশ আমাকে দেখে আবারও কাঁদতে কাঁদতে ডাকল, বাবা, বাবা! আমি বিচলিত হলাম না। আমার সামনে মতি। কিছুক্ষণের মধ্যে মতির চোখ উপড়ে ফেলা হবে। এমন ভয়াবহ সময়ে ছেলের কান্না কোন ব্যাপারই না। বাচ্চারা অকারণেই কাঁদে। আবার অকারণেই তাদের কান্না থেমে যায়। এর কান্না থামবে। এর দুঃখের অবসান হবে, কিন্তু মতি মিয়ার কি হবে।

ছেলের কান্না থেমেছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মা তাকে বিছানায় শুইয়ে নিজে মাথার কাছে মূর্তির মত বসে আছে। আমার এখন খারাপ লাগতে শুরু করেছে। আমার মনে পড়েছে, নুহাশের সকাল থেকে জ্বর। তার মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমি নিয়ে যাইনি। ডাক্তারের চেম্বারে তিন ঘন্টা বসে থেকে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ আমার

ভাল লাগে না। একগাদা রোগির মাঝখানে বসে থাকা! হাতে নম্বর ধরিয়ে দেয়া হয়েছে — বিয়াল্লিশ। ডাক্তার সাহেব দেখছেন সাত নাম্বার। কখন বিয়াল্লিশ আসবে কে জানে?

ডাক্তার নিয়ে যা করার গুলতেকিন করবে। আমি এর মধ্যে নেই।

বাজারে যেতে হবে? নোংরা মাছ-বাজারে থলি হাতে ঘোরা এবং প্রতিটি আইটেমে ঠকে আসা আমাকে দিয়ে হবে ন। সেও গুলতেকিনের ডিপার্টমেন্ট।

বাচ্চা-কাচ্চাদের পড়াশোনা দেখা? অসম্ভব ব্যাপার। নিজের পড়া নিয়েই কূল পাচ্ছি না। এদের পড়া কখন দেখব? যা হবার হবে।

সংসার জলে ভেসে যাচ্ছে? যাক ভেসে।

খুব স্বার্থপরের মত কথা। আমি অবশ্যই স্বার্থপর। নিজেরটাই দেখি — আর কিছু না। টিভিতে নাটক চলছে — আমার সমস্ত মমতা নাটকের জন্যে। রেকর্ডিং থেকে রাত বারটা-একটায় ফিরি। কোন রকম ক্লান্তি বোধ করি না। বাসার সবাই যে না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে তা আমার চোখে পড়ে না। নাটক ছাড়া তখন মাথায় আর কিছুই ঢুকে না। এই মুহূর্তে নাটক ছাড়া আমার ভুবনে আর কিছু নেই।

মেয়ের জন্মদিন হবে। সে তার সব বান্ধবীকে দাওয়াত দিয়েছে। না, আমি তো থাকতে পারব না। নাটকের রিহার্সেল আছে। জন্মদিন প্রতি বছর একবার করে আসবে। রিহার্সেল তো প্রতি বছর একবার করে আসবে না। এরা বুঝতে পারে না — নাটকের রিহার্সেল আমার জন্যে এত জরুরি কেন। আমি বুঝতে পারি না জন্মদিন ওদের এত জরুরি কেন? ক্রমে ক্রমেই আমরা দূরে সরে যাই। আমরা ব্যথিত হই। সেই ব্যথা কেউ কাউকে বুঝাতে পারি না।

অন্যসব ছেলেদের মত আমারও ইচ্ছা ছিল নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব। অন্য দশজনের মত হলে আমার চলবে না। আমাকে আলাদা হতে হবে চারপাশের মানুষদের মধ্যে যা কিছু ভাল গুণ দেখেছি তাই নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছি —। চেষ্টা পর্যন্তই, লাভ কিছু হয়নি। মানুষ পরিবেশ দিয়ে পরিচালিত হয় না, মানুষের চালিকাশক্তি তার ডি এন এ। যা সে জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছে। তার চারপাশের জগৎ তাকে সামান্যই প্রভাবিত করে।

আমি আমার ডি এন এ অণুর গঠন কি জানি না। আমাদের জ্ঞান সেই পর্যন্ত পৌঁছেনি। একদিন পৌঁছবে, তখন সবার ডি এন এ অণুর প্রিন্টআউট তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। তা দেখেই সে বুঝবে সে কেমন। অন্যরাও বুঝবে। সব রকম অস্পষ্টতার অবসান হবে।

মায়েরা তখন বাচ্চার রেজাল্ট কেন খারাপ হয়েছে এ নিয়ে বাচ্চাকে বকা-ঝকা

করবেন না, কারণ তাঁরা ডি এন এ প্রিন্ট আউট দেখেই বুঝবেন — এ পরীক্ষায় কখনোই তেমন ভাল করবে না। প্রতিদিন একটা করে প্রাইভেট টিউটর গুলে খাইয়ে দিলেও লাভ হবে না। সেই সময় একটি শিশুর জন্মের পর পরই সবাই জানবে, বড় হয়ে এ হবে অন্যদের চয়ে একটু আলাদা। সে জোছনা দেখলে অভিভূত হবে, বৃষ্টি দেখলে অভিভূত হবে, সারাক্ষণ তার মাথায় খেলা করবে — অন্য এক বোধ।

ব্যাপারটা হয়ত খুব সুখকর হবে না, কারণ তখন মানুষের ভেতর রহস্য বলে কিছু থাকবে না। একজন অন্য একজনকে পড়ে ফেলবে খোলা বইয়ের মত। মানুষের সবচে' বড় অহংকার হল, সে বই নয়। তাকে কখনো পড়া যায় না। তারপরেও মানুষকে বই ভাবতে আমার ভাল লাগে। একেকজন মানুষ যেন একেকটা বই। কোন বই সহজ তড়তড় করে পড়া যায়। কোন বই অসম্ভব জটিল। আবার কোন কোন বইয়ের হরফ অজানা। সেই বই পড়তে হলে আগে হরফ বুঝতে হবে। আবার কিছু কিছু বই আছে যার পাতাগুলি সাদা। কিছু সেখানে লেখা নেই। বড়ই রহস্যময় সে বই।

আমার নিজের বইটা কেমন? খুব জটিল নয় বলেই আমার ধারণা। সরল ভাষায় বইটি লেখা। যে কেউ পড়েই বুঝতে পারবে।

কিন্তু সত্যি কি পারবে?

সারল্যের ভেতরেও তো থাকে ভয়াবহ জটিলতা। যেখানে আমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারি না সেখানে বাইরের কেউ আমাকে কি করে বুঝবে?

আমার নিজের অনেকটাই আমার কাছে অজানা। কিছু কিছু কাজ আমি করি — কেন করি নিজেই জানি না। অন্য কেউ আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয় বলে মাঝে মাঝে মনে হয়। আমার এই স্বীকারোক্তি থেকে কেউ মনে না করেন যে, আমি আমার কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব অন্য কোন অজানা শক্তির উপর ফেলে দেবার চেষ্টা করছি। আমি ভাল করেই জানি, আমার প্রতিটি কর্ম-কাণ্ডের দায়-দায়িত্ব আমার। অন্যের নয়।

লেখালেখির ব্যাপারটাই ধরা যাক। অনেকবার আমার মনে হয়েছে, লেখালেখির পুরো ব্যাপারটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য কেউ। যার নিয়ন্ত্রণ কঠিন। যে নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে বের হওয়ার কোন ক্ষমতা আমার নেই —। নিজের একটা লেখা থেকে উদাহরণ দেই — কৃষ্ণপক্ষ।

মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস লিখব — এই ভেবে শুরু করলাম। শুরুটা হল এই ভাবে —

"নোটটা বদলাইয়া দেন আফা, ছিঁড়া নোট।"

প্রথম বাক্যটি লিখেই পুরো গল্প মাথায় সাজিয়ে নিলাম —। সমস্যা দেখা দিল তখন। দ্বিতীয় বাক্যটি আর লিখতে পারি না। কত পৃষ্ঠা যে নষ্ট করলাম। প্রতিটিতে একটা বাক্য লেখা — "নোটটা বদলাইয়া দেন আফা, ছিড়া নোট।" বাসার সবাই অস্থির — হচ্ছে কি এসব? তাদের চেয়েও বেশি অস্থির আমি। পুরো গল্প আমি সাজিয়ে বসে আছি, অথচ লিখতে পারছি না। এ কী যন্ত্রণা। শেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঠিক করলাম, যা হবার হবে। আগে থেকে ঠিকঠাক করা গল্প লিখব না। যা আসে আসুক।

শুরু হল লেখা। পাতার পর পাতা লেখা হতে লাগল। এমন এক গল্প যা আমি লিখতে চাই নি। উপন্যাসের নায়কের ভাগ্য যেন পূর্ব-নির্ধারিত। লেখক হিসেবে তা বদলানোর কোন রকম ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়নি। আমি একজন কপিরাইটার। কপি করছি, এর বেশি কিছু না। কে করাচ্ছে কপি? আমার ডিএনএ অণু, না অন্য কিছু?

আমি জানি না। মাঝে মাঝে এই ভেবে কষ্ট পাই — নিজের সম্পর্কে আমরা এত কম জানি কেন? প্রকৃতি কি চায় না আমরা নিজেকে জানি?

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলি। সন্ধ্যা থেকেই কাজ করছি। খাটের পাশে ছোট্ট টেবিল নিয়ে মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছি। এক মুহূর্তের জন্যেও মাথা তুলছি না। হঠাৎ কি যেন হল। মনে হল — কিছু একটা হয়েছে। অদ্ভুত কিছু ঘটে গেছে। বিরাট কোন ঘটনা, আর আমি তাতে অংশগ্রহণ না করে বোকার মত মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছি। লেখার খাতা বন্ধ করে উঠে পড়লাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি। অস্থিরতা খুব বাড়ল। একবার মনে হল, এইসব মাথা খারাপের পূর্ব লক্ষণ। মাথা খারাপের আগে আগে নিশ্চয়ই মানুষের এমন ভয়ংকর অস্থিরতা হয়। বারান্দায় এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতার কারণ স্পষ্ট হল — আজ পূর্ণিমা। আকাশভরা জোছনা। প্রকৃতির এই অসাধারণ সৌন্দর্য উপেক্ষা করে আমি কি-না ঘরের অন্ধকার কোণে বসে আছি?

অনেকেই বলবেন, এটা এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা না। যেহেতু জোছনা আমার প্রিয়, আমার অবচেতন মন খেয়াল রাখছে কবে জোছনা। সেই অবচেতন মনই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আর কিছু নয়। অবচেতন মনের উপর দিয়ে অনেক কিছু আমরা পার করে দেই। ডাক্তারদের যেমন 'এলার্জি', মনোবিজ্ঞানীদের তেমনি — 'অবচেতন মন'। যখন রোগ ধরতে পারেন না তখন ডাক্তাররা গম্ভীর মুখে বলেন এলার্জি, মনোবিজ্ঞানী যখন সমস্যা ধরতে পারেন না, তখন বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন — অবচেতন মনের কারসাজি। আর কিছুই না।

সেই অবচেতন মনটাই বা কি? কতটুকু তার ক্ষমতা? লেখকদের লেখালেখি

কি অবচেতন মন নামক সমুদ্রে ভেসে উঠে? সেখান থেকে চলে আসে চেতন জগতে? ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য জগত থেকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে তার আগমন?

সেই ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য জগতটি আমার জানতে ইচ্ছে করে, বুঝতে ইচ্ছে করে।

অনার্স ক্লাসে আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াই। আমাকে পড়াতে হয় ভারনার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র। আমি বলি — শোন ছেলেমেয়েরা, কোন বস্তুর অবস্থান ও গতি একই সময়ে নির্ণয় করা যায় না। এই দুয়ের ভেতর সবসময় থাকে এক অনিশ্চয়তা। তুমি অবস্থান পুরোপুরি জানলে গতিতে অনিশ্চয়তা চলে আসবে। আবার গতি জানলে অনিশ্চয়তা চলে আসবে অবস্থানে।

ছাত্ররা প্রশ্ন করে — স্যার কেন?

আমি নির্বিকার থাকার চেষ্টা করতে করতে বলি — এটা প্রকৃতির বেঁধে দেয়া নিয়ম। প্রকৃতি চায় না আমরা গতি ও অবস্থান ঠিকঠাক জানি। জ্ঞানের অনেকখানি প্রকৃতি নিজের কাছে রেখে দেয়। প্রকাশ করে না।

'কেন স্যার?'

'জানি না।'

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের অনেক প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয় —"জানি না।"

জ্ঞানের তীব্র পিপাসা দিয়ে মানুষকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনিই আবার জ্ঞানের একটি অংশ মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন।

'কেন?'

উত্তর জানা নেই।

এই মহাবিশ্বের বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরই আমাদের জানা নেই। আমরা জানতে চেষ্টা করছি। যতই জানছি ততই বিচলিত হচ্ছি। আরো নতুন সব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা নিদারুণ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন তাঁদের সামনে কঠিন কালো পর্দা। যা কোনদিনই উঠানো সম্ভব হবে না। কি আছে এই পর্দার আড়ালে তা জানা যাবে না।

আমার যাবতীয় রচনায় আমি ঐ কালো পর্দাটির প্রতি ইংগিত করি। আমি জানি না আমার পাঠক-পাঠিকারা সেই ইংগিত কি ধরতে পারেন, না-কি তার গল্প পড়েই তৃপ্তি পান। উদাহরণ দেই।

কৃষ্ণপক্ষ উপন্যাসের নায়ক মুহিবের বিয়ের দিন। একটা কটকটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। সবাই তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি করল। ছেলেটি মারা গেল বিয়ের পর দিন। তার স্ত্রী অরুর বিয়ে হল অন্য এক জায়গায়। কেটে গেল দীর্ঘ কুড়ি বছর। কুড়ি বছর পর সেই অরুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বাড়িতে তুমুল

উত্তেজনা। বর এসেছে, বর এসেছে। অরু আগ্রহ করে নিজেও তাঁর কন্যার বর দেখতে গেলেন। ছেলেকে দেখেই তিনি চমকে উঠলেন। তার গায়েও কটকটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। যেন এই ছেলে কুড়ি বছর আগের মুহিবের পাঞ্জাবিটা পরে চলে এসেছে।

অনেকেই আমাকে বলেছেন, কৃষ্ণপক্ষ উপন্যাস থেকে হলুদ পাঞ্জাবির অংশটা বাদ দিলে উপন্যাসটা সুন্দর হত। উপন্যাসে এই অংশটুকুই দুর্বল। হিন্দী ছবির মত মেলোড্রামা।

অথচ উপন্যাসটা লেখাই হয়েছে হলুদ পাঞ্জাবির ব্যাপারটির জন্যে। আমি কি আমার বোধ পাঠকদের কাছে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হচ্ছি? এরা হিমুর বাইরের রূপটি দেখে। তার উদ্ভট কাণ্ড-কারখানায় মজা পায় — কিন্তু এর বাইরেও তো হিমুর অনেক কিছু বলার আছে। হিমু ক্রমাগত বলেও যাচ্ছে — কেন কেউ তা ধরতে পারছে না? লেখক হিসেবে এরচে' বড় ব্যর্থতা আরে কি হতে পারে?

আমি আমার গল্পটা লিখে শেষ করেছি। মতির চোখ উপড়ে ফেলার গল্প। সাধারণত গল্পগুলি আমি গভীর রাতে শেষ করি। এই প্রথম শেষ করলাম বিকেলে। আনন্দে চোখে পানি এসে গেল। চোখ মুছে শোবার ঘরে এসে দেখি — আমার মেয়েরা সবাই সাজ-পোশাক পরছে। একেকজনকে পরীর মত দেখাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যাপার কি?

ওরা ঝলমল করতে করতে বলল, তুমি কাপড় পরে নাও। দেরি করছ কেন? আমরা বিয়েতে যাব না?

ওদের মা বলল, তোর বাবার চোখ দেখে বুঝতে পারছিস না, সে যাবে না? সে ঘরে চুপচাপ একা একা বসে থাকবে।

বড় মেয়ে দুঃখীত গলায় বলল, বাবা তুমি যাবে না?

আমি বললাম, অবশ্যই যাব। কে বলছে যাব না?

শার্ট-পেন্ট ইস্ত্রি করা নিয়ে অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বিয়েবাড়িতেও সবার সঙ্গে খুব হৈ-চৈ করলাম। গল্প-গুজব, রসিকতা। সবাই ভাবল, বাহ লোকটা বেশ মজার তো। কেউ আমার নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারল না। শুধু এক ফাঁকে গুলতেকিন এসে বলল, তোমার কি হয়েছে?

আমি জবাব দিলাম না। আমার কি হয়েছে আমি নিজেই কি ছাই জানি? শুধু জানি, মতি মিয়ার গল্প লিখে শেষ করেছি। মতি মিয়া এখন আর আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কাতর অনুনয় করবে না — স্যার, আমার ব্যাপারটা লিখে ফেলুন।

জীবনের গভীরতম বোধকে আমি অনুভব করতে পারি। জোছনার অপূর্ব ফুলকে আমি দেখতে পাই — কিন্তু তারা অন্তরের এতই গভীরে যে, আমি তুলে আনতে পারি না। বার বার হাত ফসকে যায়। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী জেগে আমি অপেক্ষা করি। কোন দিন কি পারব সেই মহান বোধকে স্পর্শ করতে?

নিজেকে বোঝাই — ভাগ্যে যা আছে তা হবে।

Every man's fate
We have fastened
On his own neek

(সুরা বনি ইস্রায়িল)

আমরা কি করব না করব সবই পূর্ব-নির্ধারিত। কি হবে চিন্তা করে? নিয়তির হাতে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল।

আমি অপেক্ষা করি।

চোখ

আজ বাদ-আছর খেজুর কাঁটা দিয়ে মতি মিয়ার চোখ তুলে ফেলা হবে। চোখ তুলবে নবীনগরের ইদরিস। এই কাজ সে আগেও একবার করেছে।

মতি মিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে বরকত সাহেবের বাংলা ঘরে। তার হাত-পা বাঁধা। একদল মানুষ তাকে পাহারা দিচ্ছে। যদিও তার প্রয়োজন ছিল না, পালিয়ে যাওয়া দূরের কথা, মতি মিয়ার উঠে বসার শক্তি পর্যন্ত নেই। তার পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। ডান হাতের সব কটা আঙুল থেঁতলে ফেলা হয়েছে। নাকের কাছে সিকনির মত রক্ত ঝুলে আছে। পরনের সাদা পাঞ্জাবি রক্তে মাখামাখি হয়ে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে। ঘণ্টাখানিক আগেও তার জ্ঞান ছিল না। এখন জ্ঞান আছে, তবে বোধশক্তি ফিরেছে বলে মনে হয় না। তার চোখ তুলে ফেলা হবে এই খবরেও সে বিচলিত হয়নি। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, নয়ান কখন তুলবেন?

এই পর্ব বাদ-আছর সমাধা হবে শুনে সে মনে হল নিশ্চিন্ত হল। সহজ গলায় বলল, পানি খামু, পানি দেন।

পানি চাইলে পানি দিতে হয়। না দিলে গৃহস্থের দোষ লাগে। রোজ হাশরের দিন পানি পিপাসায় বুক যখন শুকিয়ে যায় তখন পানি পাওয়া যায় না। কাজেই এক বদনা পানি এনে মতির সামনে রাখা হল। মতি বিরক্ত গলায় বলল, মুখের উপরে পানি ঢাইল্যা না দিলে খামু ক্যামনে? আমার দুই হাত বান্ধা। আপনেরার এইটা কেমুন বিবেচনা?

যে বদনা এনেছে সে মোড়ায় বসে থাকা একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, পানি ঢাইল্যা দিমু হাসান ভাই?

হাসান আলী মতিকে কেন্দুয়া বাজার থেকে ধরে এনেছে। মতির ওপর এই কারণেই তার অধিকার সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। মতির বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে হাসান আলীর মতামত জানা দরকার। হাসান আলী পানি বিষয়ে কোন

মতামত দিল না, বিস্মিত হয়ে বলল, হারামজাদা কেমন ঢং-এ কথা কয় শুনছেন? তার চউখ তোলা হইব এইটা নিয়া কোন চিন্তা নাই। ক্যাটক্যাট কইরা কথা বলতেছে। কি আচানক বিষয়! ঐ হারামজাদা, তোর মনে ভয়-ডর নাই?

মতি জবাব দিল না, থু করে থুথু ফেলল। থুথুর সঙ্গে রক্ত বের হয়ে এল। তাকে ঘিরে ভিড় বাড়ছে। খবর ছড়িয়ে পড়েছে। একজন জীবিত মানুষের চোখ খেজুর কাঁটা দিয়ে তুলে ফেলা হবে এমন উত্তেজক ঘটনা সচরাচর ঘটে না। আশা করা যাচ্ছে, আছর ওয়াক্ত নাগাদ লোকে লোকারণ্য হবে। মতিকে দেখতে শুধু যে সাধারণ লোকজন আসছে তা না, বিশিষ্ট লোকজনও আসছেন। কেন্দুয়া থেকে এসেছেন রিটায়ার্ড স্টেশন মাস্টার মোবারক সাহেব। নয়াপাড়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবও এসেছেন। হাসান আলী নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দিল। তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে চশমা বের করতে করতে বললেন, এরই নাম মতি?

হাসান আলী হাসিমুখে বলল, জ্বে হেডমাস্টার সাব, এই হারামজাদাই মতি। বাদ-আছর হারামজাদার চউখ তোলা হইব।

'এরে ধরলা ক্যামনে?'

'সেইটা আপনের এক ইতিহাস।'

পানদানিতে পান চলে এসেছে। হেডমাস্টার সাহেব পান মুখে দিতে দিতে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ঘটনাটা বল শুনি। সংক্ষেপে বলবা।

হাসান আলী এগিয়ে এল। মতিকে ধরে আনার গল্প সে এ পর্যন্ত এগারোবার বলেছে। আরো অনেকবার বলতে হবে। বিশিষ্ট লোকজন অনেকেই এখনো আসেন-নি। সবাই আলাদা আলাদা করে শুনতে চাইবেন। তাতে অসুবিধা নেই। এই গল্প এক লক্ষবার করা যায়। হাসান আলী কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল।

"ঘরে কেরাছি ছেল না। আমার পরিবার বলল, কেরাছি নাই। আমার মিজাজ গেল খারাপ হইয়া। হাটবারে কেরাছি আনলাম, আর আইজ বলে কেরাছি নাই, বিষয় কি। যাই হউক, কেরাছির বোতল হাতে লইয়া রওনা দিলাম। পথে সুলেমানের সাথে দেখা। সুলেমান কইল, চাচাজী, যান কই? . . . '

মতি নিজেও হাসান আলীর গল্প আগ্রহ নিয়ে শুনছে। প্রতিবারই গল্পের কিছু শাখা-প্রশাখা বের হচ্ছে। সুলেমানের কথা এর আগে কোন গল্পে আসেনি। এইবার এল। সুলেমানের ভূমিকা কি কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

হাসান আলী গল্প শেষ করল। হেডমাস্টার সাহেব মুগ্ধ গলায় বললেন, বিরাট সাহসের কাম করছ হাসান। বিরাট সাহস দেখাইছ। কামের কাম করছ। মতির সাথে অস্ত্রপাতি কিছু ছিল না?

'জ্বে না।'

'আল্লাপাক তোমারে বাঁচাইছে। অস্ত্রপাতি থাকলে উপায় ছিল না। তোমারে জানে শেষ কইরা দিত।'

উপস্থিত সবাই মাথা নাড়ল। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, চউখ তোলা হইব কথাটা কি সত্য?

'জ্বে সত্য। এইটা সকলের সিদ্ধান্ত। চউখ তুললেই জন্মের মত অচল হইব। থানা-পুলিশ কইরা তো কোন ফয়দা নাই।'

'অতি সত্য কথা, কোন ফয়দা নাই। তবে থানাওয়ালা ঝামেলা করে কিনা এইটা বিবেচনায় রাখা দরকার।'

'আছে, সবই বিবেচনার মইধ্যে আছে। মেম্বর সাব থানাওয়ালার কাছে গেছে।'

মতি লক্ষ্য করল, হেডমাস্টার সাহেব তার দিকে তাকিয়ে আছেন। হেডমাস্টার সাহেবের চোখে শিশুসুলভ বিস্ময় ও আনন্দ। মনে হচ্ছে, চোখ তোলার ঘটনা দেখার জন্যে তিনি আছর পর্যন্ত থেকে যাবেন। মতি তেমন ভয় পাচ্ছে না। প্রাথমিক ঝড় কেটে গেছে এটাই বড় কথা। প্রথম ধাক্কায় চোখ চলে যেতে পারত। সেটা যখন যায়নি তখন আশা আছে। আছরের আগেই কেউ-না-কেউ দয়াপরবশ হয়ে বলে ফেলবে — "থাউক, বাদ দেন। চউখ তুইলা লাভ নাই। শক্ত মাইর দিয়া ছাইড়া দেন।" একজন বললেই অনেকে তাকে সমর্থন করবে। তবে একজন কাউকে বলতে হবে। মতি নিজে ক্ষমা চাইলে হবে না। এতে এরা আরো রেগে যাবে। সে দুর্বল হলে সর্বনাশ। দুর্বলকে মানুষ করুণা করে না, ঘৃণা করে। মতি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবে। চোখ বাঁচানোর পথ বের করতে হবে। হাতে অবশ্যি সময় আছে। আছরের এখনো অনেক দেরি। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা শরীরে যন্ত্রণা, পিপাসায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। পানির বদনা সামনে আছে কিন্তু কেউ মুখে ঢেলে না দিলে খাবে কিভাবে?

হেডমাস্টার সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কি রে মতি, সিগ্রেট খাবি?

সবাই হো-হো করে হেসে ফেলল। মতি চিন্তিত বোধ করছে। এটা ভাল লক্ষণ না। এরা তাকে দেখে মজা পেতে শুরু করেছে। মানুষ মজা পায় জন্তু-জানোয়ার দেখে। এরা তাকে জন্তু-জানোয়ার ভাবতে শুরু করেছে। হাত-পা বাঁধা একটা ভয়াবহ প্রাণী। ভয়াবহ প্রাণীর চোখ উঠানো কঠিন কিছু না। তাছাড়া দূর দূর থেকে লোকজন মজা পাবার জন্যে আসছে। মজা না পেয়ে তারা যাবে না। মতি হেডমাস্টার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, পানি খাব। একজন বদনার পুরো

পানিটা তার মুখের উপর ঢেলে দিল। সবাই আবার হো-হো করে হেসে উঠল। মতির বুক ধক্ করে উঠল। অবস্থা ভাল না। তাকে দ্রুত এমন কিছু করতে হবে যেন সে পশুস্তর থেকে উঠে আসতে পারে। কি করা যায় কিছুই মাথায় আসছে না। চোখ দুটা কি আজ চলেই যাবে? মায়া-মমতা দুনিয়া থেকে উঠে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন তার মত লোকের শাস্তি ছিল মাথা কামিয়ে গলায় জুতার মালা ঝুলানো। তারপর এল ঠেং-ভাঙা শাস্তি, ঠেং ভেঙে লুলা করে দেয়া। আর এখন চোখ তুলে দেয়া। একটা খেজুর কাঁটা দিয়ে পুট করে চোখ বের করে আনা। এতগুলি লোক তাকে ঘিরে আছে, কারো চোখে কোন মমতা নেই। অবশ্যি হাতে এখনো সময় আছে। মমতা চট করে তৈরি হয় না। মমতা তৈরি হতেও সময় লাগে। মতি হাসান আলীর দিকে তাকিয়ে হাসল। মানুষের হাসি খুব অদ্ভুত জিনিস। জন্তু-জানোয়ার হাসতে পারে না। মানুষ হাসে। একজন 'হাসন্ত' মানুষের উপর রাগ থাকে না।

হাসান আলী চেঁচিয়ে উঠল, দেখ, হারামজাদা হাসে। ভয়ের চিহ্নটা নাই। কিছুক্ষণের মইধ্যে চউখ চইল্যা যাইতেছে, তারপরেও হাসি। দেখি, এর গালে একটা চড় দেও দেখি।

প্রচণ্ড চড়ে মতি দলা পাকিয়ে গেল। হাত-পা বাঁধা, নয়ত চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ত। কিছুক্ষণের জন্যে মতির বোধশক্তি লোপ পেল। মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার। এরা কি চোখ তুলে ফেলেছে? মনে হয় তাই। পানির পিপাসা দূর হয়েছে। পিপাসা নেই। এটা মন্দ না। মাথার ভেতর পাক দিচ্ছে, মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞান হবার আগে আগে এরকম হয়। অজ্ঞান হওয়া খুব আনন্দদায়ক ব্যাপার। দ্রুত শরীরের ব্যথা-বেদনা চলে যায়। শরীর হাল্কা হতে থাকে।

না, চোখ যায়নি। চোখ এখনো আছে। এই তো সবকিছু দেখা যাচ্ছে। মতি মনে মনে বলল, "শালার লোক কি হইছে! মেলা বইস্যা গেছে।" বেলা পড়ে এসেছে। আছর ওয়াক্ত হয়ে গেল না-কি? না মনে হয়। আলো খুব বেশি। তাকে বাংলা ঘর থেকে বের করে উঠোনে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এই জন্যেই আলো বেশি লাগছে।

মতি বলল, কয়টা বাজে?

'কয়টা বাজে তা দিয়া দরকার নাই। সময় হইয়া আসছে। যা দেখনের দেইখ্যা নে রে মতি।'

মতি চারদিকে তাকালো। তার আশেপাশে কোন ছোট ছেলেমেয়ে নেই। মহিলা নেই। এদের বোধহয় সরিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকজন তাকে ঘিরে গোল হয়ে

আছে। তার সামনে জলচৌকির উপর নীল গেঞ্জি এবং সাদা লুঙ্গি পরে যে বসে আছে সে-ই কি চোখ তুলবে? সে-ই কি নবীনগরের ইদরিস? কখন এসেছে ইদরিস? লোকটার ভাবভঙ্গি দশজনের মত না। তাকাচ্ছে অন্যরকম করে। তার চেয়েও বড় কথা, আশেপাশের লোকজন এখন নীল গেঞ্জিওয়ালাকেই দেখছে। মতির প্রতি তাদের এখন আর কোন আগ্রহ নেই। তারা অপেক্ষা করছে বড় ঘটনার জন্য। নীল গেঞ্জি পরা লোকটার সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা জেনে নেয়া যায়। মতি অপেক্ষা করছে কখন লোকটা তাকায় তার দিকে। যেই তাকাবে ওম্নি মতি কথা বলবে। চোখের দিকে না তাকিয়ে কথা বললে কোন আরাম নেই। কিন্তু লোকটা তাকাচ্ছে না।

'ভাইজান, ও ভাইজান।'

নীল গেঞ্জি তাকাল মতির দিকে। মতি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আফনের নাম কি ইদরিস মিয়া? নীল গেঞ্জি জবাব দিল না। মাথা ঘুরিয়ে নিল। মতি আরো আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, ভাইজান, আফনেই কি আমার চউখ তুলবেন?

পেছন থেকে একজন বলল, হারামজাদা কয় কি! সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। এই কথায় হাসার কি আছে মতি বুঝতে পারছে না। কথাটা কি সে বিশেষ কোন ভঙ্গিতে বলেছে? সাধারণ কথাও কেউ কেউ খুব মজা করে বলতে পারে। তার বৌ পারত। অতি সাধারণ কথা এমনভাবে বলত যে হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে যেত। ভাত বেড়ে ডাকতে এসে বলত, ভাত দিছি, আসেন। কষ্ট কইরা তিন-চাইরটা ভাত খান। না, বৌয়ের কথা ভাবার এখন সময় না। এখন নিজের নয়ন বাঁচানোর বুদ্ধি বের করতে হবে। নয়ন বাঁচলে বৌয়ের কথা ভাবা যাবে। নয়ন না বাঁচলেও ভাবা যাবে। ভাবার জন্যে নয়ন লাগে না। বৌয়ের কথা সে অবশ্যি এম্নিতেও বিশেষ ভাবে না। শুধু হাজতে বা জেলখানায় থাকলেই তার কথা মনে আসে। তখন তার কথা ভাবতেও ভাল লাগে। মেয়েটার অবশ্যি কষ্টের সীমা ছিল না। সে জেলে গেলেই রাতদুপুরে চৌকিদার, থানাওয়ালা বাড়িতে উপস্থিত হত। বিষয় কি? খোঁজ নিতে আসছে মতি ঘরে আছে কি-না। সুন্দর একটা মেয়ে। খালি বাড়িতে থাকে। থানাওয়ালারা তো রাতদুপুরে সেই বাড়িতে যাবেই। বাড়িতে যাবে। পান খাবে। আরও কত কি করবে। ডাকাতের বৌ হল সবার বৌ। এই অবস্থায় কোন মেয়ে থাকে না। তার বৌ-টা তারপরেও অনেক দিন ছিল। মতি প্রতিবারই বাড়ি ফিরত আতংক নিয়ে। বাড়ির সামনে এসে মনে হত এইবার বাড়িতে ঢুকে দেখবে, বাড়ি খালি। কেউ নেই।

বৌ চলে গেছে গত বৈশাখ মাসে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। পাড়ার কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিল। কেউ বলতে পারে না। একজন বলল, অনেক

দিন তো থাকল, আর কত? বাজারে গিয়া খোঁজ নেও। মনে হয় বাজারে ঘর নিছে। জগতের অনেক সত্যের মত এই সত্যও সে গ্রহণ করেছে সহজভাবে। চোর-ডাকাতের বৌদের শেষ আশ্রয় হয় বাজার। বাজারে তারা মোটামুটি সুখেই থাকে। মুখে রঙ-চঙ মেখে সন্ধ্যাকালে চিকন গলায় ডাকে, ও বেপারি, আহেন, পান-তামুক খাইয়া যান। শীতের দিন শইলডা গরম করন দরকার আছে।

অবসর পেলেই মতি আজকাল বাজারে-বাজারে ঘুরে। বৌটাকে পাওয়া গেলে মনে শান্তি। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার আর করবে না। তাতে লাভ কি? বৌটা কোন এক জায়গায় থিতু হয়েছে এটা জানা থাকলেও মনে আনন্দ। মাঝে-মধ্যে আসা যাবে। আপনার মানুষের কাছে কিছুক্ষণ বসলেও ভাল লাগে। আপনার মানুষ সংসারে থাকলেও আপনার, বাজারে থাকলেও আপনার।

বৌ কেন্দুয়া বাজারে আছে এরকম একটা উড়া-খবর শুনে মতি কেন্দুয়া এসেছিল। উড়া-খবর কখনো ঠিক হয় না। তার বেলা ঠিক হয়ে গেল। বৌ এখানেই আছে। নাম নিয়েছে মর্জিনা। বাজারে ঘর নিলে নতুন নাম নিতে হয়। মর্জিনার সঙ্গে দেখা করতে যাবার মুখে এই বিপদ।

আজান হচ্ছে। আছর ওয়াক্ত হয়ে গেছে। মতি অনেক কষ্টে পাশ ফিরল। তারা চোখ কখন তুলবে? নামাজের আগে নিশ্চয়ই না। কিছুটা সময় এখনো হাতে আছে। এর মধ্যে কত কিছু হয়ে যেতে পারে। মহাখালি রেল স্টেশনে সে একবার ধরা পড়ল। তাকে মেরেই ফেলত। ট্রেনের কামরা থেকে একটা মেয়ে ছুটে নেমে এল। চিৎকার করে বলল, আপনারা কি মানুষটাকে মেরে ফেলবেন? খবর্দার, আর না। খবর্দার। মেয়েটির মূর্তি দেখেই লোকজন হকচকিয়ে গেল। লোকজনের কথা বাদ থাক, সে নিজেই হতভম্ব। জীবন বাঁচানোর জন্যে মেয়েটিকে সামান্য ধন্যবাদও দেয়া হয়নি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সেই মেয়ে চলে গেছে কোথায় না কোথায়।

আজ এই যে এত লোক চারপাশে ভিড় করে আছে এদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ আছে ঐ মেয়েটির মত। সে অবশ্যই শেষ মুহূর্তে ছুটে এসে বলবে, "করেন কি। করেন কি।" আর এতেই মতির নয়ন রক্ষা পাবে। এইটুক বিশ্বাস তো মানুষের প্রতি রাখতেই হবে। মতি মিয়া অপেক্ষা করে। কে হবে সেই লোকটি। না জানি সে দেখতে কেমন। সেই লোকটির চোখ কি ট্রেনের মেয়েটির চোখের মত মমতামাখা হবে? যে চোখের দিকে তাকালে ভাল হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মতি মিয়া চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করতে তার ভালই লাগে।

পেট্রিফায়েড ফরেস্ট

অভিশাপে পাথর হয়ে যাবার ব্যাপার রূপকথার বই-এ পাওয়া যায়। ঐ যে দুষ্ট যাদুকর রাজকন্যাকে পাথর বানিয়ে ফেলল। বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টিতে পড়ে রইল সেই পাথরের মূর্তি। তারপর এক শুভক্ষণে রাজপুত্র এসে তাকে অভিশাপমুক্ত করল। পাথরের মূর্তি প্রাণ ফিরে পেল। তারা দু'জন সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগল।

শৈশবের রূপকথার গল্পকে গুরুত্ব দেবার কোন কারণ নেই, কিন্তু যৌবনে আবার শৈশবের গল্প নতুন করে পড়লাম। উপন্যাসটির নাম "পেট্রিফায়েড ফরেস্ট" অর্থাৎ প্রস্তরীভূত অরণ্য। এই উপন্যাসের তরুণ নায়ক সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ণ মুখে 'পেট্রিফায়েড ফরেস্ট'-এ ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে পাথরের গাছপালা। তার মাঝে পাথরের মত মুখ করে এ যুগের নায়ক বসে থাকে। আমার কাছে মনে হয়, এ কী ছেলেমানুষি! রূপকথার পাথরের অরণ্য এই যুগে কোত্থেকে আসবে? পাথরের অরণ্য থাকতে পারে না।

আমার অনেক ধারণার মত এই ধারণাও পরবর্তীতে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। প্রস্তরীভূত অরণ্য দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়। সেই গল্প বলা যেতে পারে।

তখন থাকি আমেরিকার নর্থ ডাকোটায়। সংসার ছোট — আমি, আমার স্ত্রী এবং একমাত্র মেয়ে নোভা। টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে মাসে চারশ' ডলারের মত পাই। দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। ঘুরে বেড়ানোর প্রচণ্ড শখ। শখ মেটানোর উপায় নেই। খুবই খরচান্ত ব্যাপার। আমেরিকা বিশাল দেশ। দেখার জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তখনো কিছুই দেখা হয়নি। ছ'শ ডলার দিয়ে লক্কড় মার্কা একটি ফোর্ড গাড়ি কিনেছি। সেই গাড়ি নিয়ে বেরুতে সাহস হয় না। ইঞ্জিন গরম হলেই এই গাড়ি মহিষের মত বিচিত্র শব্দ করে।

এই অবস্থায় বেড়াতে যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। আমার পাশের ফ্ল্যাটের মালয়েশিয়ান ছাত্র এক সকালে এসে বলল, আহমদ, আমি গতকাল একটা নতুন গাড়ি কিনেছি — শেভ্রলেট। পাঁচ হাজার ডলার পড়ল।

আমি বললাম, বাহ্, ভাল তো।

'এখন ঠিক করেছি গাড়িটা লং রুটে টেস্ট করব। গাড়ি হচ্ছে স্ত্রীর মত। স্ত্রীকে যেমন পোষ মানাতে হয়, গাড়িকেও পোষ মানাতে হয়। আমি আজ সন্ধ্যায় রওনা হচ্ছি সাউথ ডাকোটায়।'

'খুব ভাল।'

'তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে যদিও আমার তেমন পরিচয় নেই, তবু তুমি আমার প্রতিবেশী। তুমি যেমন মুসলমান, আমিও মুসলমান। অবশ্য আমি খারাপ মুসলমান, নিয়মিত মদ খাই।'

আমি মালয়েশিয়ান ছেলেটির কথাবার্তায় চমৎকৃত হলাম। সে বলল, আমি তোমার নাম জানি, কিন্তু তুমি আমার নাম জান না। দশ ডলার বাজি। বল দেখি আমার নাম কি?

আমি বললাম, 'আইজেক।'

'আইজেক হচ্ছে আমার ছেলের নাম। আমার নাম আবদাল। যাই হোক, তুমি তৈরি থেকো। ঠিক সন্ধ্যায় আমরা রওনা হব।'

আমি বললাম, নতুন গাড়িতে যাচ্ছ, তোমার স্ত্রী এবং ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো ভাল হবে।

'মোটেই ভাল হবে না। তুমি আমার স্ত্রীকে চেন না। ওকে আমি সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া তোমাকে আগেই বলেছি, গাড়ি হচ্ছে স্ত্রীর মত। দু'জন স্ত্রীকে নিয়ে বের হওয়া কি ঠিক?'

আমি আবদালের লজিকে আবারো চমৎকৃত হলাম। তাকে বিনীতভাবে বললাম, আমার পক্ষে আমার স্ত্রী ও কন্যাকে ফেলে একা একা বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হবে না। ওদের মন খারাপ হবে। আমারও ভাল লাগবে না।

আবদাল বিমর্ষ মুখে চলে গেল। আমার স্ত্রী গুলতেকিন বলল, ওর সঙ্গে যেতে রাজি না হয়ে খুব ভাল করেছ। পাগল ধরনের লোক। তবে ওর বউটা খুব ভাল। তার নাম 'রোওজি'। এমন ভাল মেয়ে আমি কম দেখেছি। চেহারাও রাজকন্যাদের মত।

বিকেলে আবদাল আবার এল। তার মুখের বিমর্ষ ভাব দূর হয়েছে। সে হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে, তুমি তোমার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে নাও। আমি আমারটাকে নিচ্ছি। ঘুরে আসি।

আমি বললাম, এত মানুষ থাকতে তুমি আমাকে নিতে আগ্রহী কেন? আবদাল বলল, অনেকগুলি কারণ আছে — তুমি আমার প্রতিবেশী, তুমি মুসলমান এবং তুমি রোজ বিকেলে তোমার মেয়েকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। দেখতে বড় ভাল লাগে। আমারো ইচ্ছে করে আমার ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে। তবে আমার

ছেলেটা হল মহাশয়তান। মা'র কাছ থেকে সব শয়তানি বুদ্ধি পেয়েছে। এইজন্যে ওকে কাঁধে নেই না। তাও একদিন নিয়েছিলাম। কাঁধে তোলামাত্র পিসাব করে দিল। প্রাকৃতিক কারণে করেছে তা না, ইচ্ছে করে করেছে।

'রাতে রওনা হবার দরকার কি? আমরা বরং ভোরবেলা রওনা হই। দৃশ্য দেখতে দেখতে যাই।'

'আমেরিকায় দেখার মত কোন দৃশ্য নেই। মাইলের পর মাইল ধু-ধু মাঠ। ঐ মাঠগুলি গরুর পায়খানা করার জন্য অতি উত্তম। কাজেই রাতে যাচ্ছি। তাছাড়া স্ত্রীকে যেমন রাতে পোষ মানাতে হয়, গাড়িকেও তেমনি রাতে পোষ মানাতে হয়।'

সন্ধ্যা মিলাবার পর আমরা রওনা হলাম। গ্যাস স্টেশনে গ্যাস নেবার জন্যে গাড়ি দাঁড়াল। আবদাল নেমে গেল, গ্যাস নিল, দু'-একটা টুকিটাকি জিনিস কিনবে। আবদালের স্ত্রী রোওজি আমার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, ভাইজান, আমি কি আপনার সঙ্গে দুটা কথা বলার অনুমতি পেতে পারি? আমি মেয়েটির চমৎকার ইংরেজি শুনে যেমন মুগ্ধ হলাম, তেমনি মুগ্ধ হলাম তার রূপ দেখে। মালয়েশিয়ানদের চামড়া আমাদের মত শ্যামলা। এই মেয়েটির গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশানো। মিশরী মেয়েদের মত টানা-টানা চোখ, লম্বা চুল। লাল টকটকে কমলার কোয়ার মত ঠোঁট।

আমি বললাম, বলুন কি বলবেন। আমি শুনছি।

'আপনি যে আপনার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আপনি থাকায় আমি খুব ভরসা পাচ্ছি — আমার স্বামী খুব দ্রুত গাড়ি চালায়। আপনি একটু লক্ষ রাখবেন।'

'অবশ্যই লক্ষ রাখব।'

'তার চেয়েও বড় সমস্যা, রাতের বেলা হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর সময় সে প্রায়ই স্টিয়ারিং হুইল ধরে ঘুমিয়ে পড়ে।'

'সে কি!'

'জ্বি — অনেকবার বড় ধরনের অ্যাকসিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছি।'

'আরো কিছু বলার আছে?'

'এখন বলব না। এখন বললে আপনি ভয় পাবেন। আল্লাহ আল্লাহ করে ট্রিপ শেষ করে ফিরে আসি, তারপর আপনাকে বলব।'

সাউথ ডাকোটায় অনেক দেখার জিনিস আছে। টুরিস্টরা প্রথমে দেখে পাথরের গায়ে খোদাই করা চার প্রেসিডেন্টের মাথা। দল নিয়ে দেখতে গেলাম। আবদাল ভুরু কুঁচকে বলল, এর মধ্যে দেখার কি আছে বুঝলাম না। হাতুড়ি-বাটাল দিয়ে

পাহাড়গুলি নষ্ট করেছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়?

রোওজি বলল, আমার কাছে তো খুব সুন্দর লাগছে।

আবদাল বলল, তোমার কাছে তো সুন্দর লাগবেই। তুমি হলে বুদ্ধিহীনা নারী। বুদ্ধিহীনা নারী যা দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়।

আমি রোওজিকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বললাম, আমি বুদ্ধিহীনা নারী নই কিন্তু আমার কাছেও ভাল লাগছে।

'ভাল লাগলে ভাল। তোমরা থাক এখানে, আমি দেখি কোন পাব-টাব পাওয়া যায় কিনা। কয়েকটা বিয়ার না খেলে চলছে না।'

আবদাল বিয়ারের খোঁজে চলে গেল।

আমরা অনেক ছবি-টবি তুললাম। খাঁটি টুরিস্টের মত ঘুরলাম। তারপর আবদালের খোঁজে গিয়ে দেখি সে পাঁড় মাতাল। টেবিল থেকে মাথা তুলতে পারছে না এমন অবস্থা। আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, খবর সব ভাল?

আমি বললাম, ভাল! তোমার এ কী অবস্থা।

'কোন চিন্তা করবে না। মাতাল অবস্থায় আমি সবচেয়ে ভাল গাড়ি চালাই। চল, রওনা হওয়া যাক।'

'এখনি রওনা হওয়া যাবে না। আরো অনেক কিছু দেখার আছে। তাছাড়া তোমারও মনে হয় বিশ্রাম দরকার।'

'আমার কোনই বিশ্রাম দরকার নেই এবং এখানে দেখারও কিছু নেই।'

'স্ফটিক গুহার খুব নাম শুনেছি। না দেখে গেলে আফসোস থাকবে।'

আবদাল বলল, গুহা দেখার কোন দরকার নেই। গুহা জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে। মানুষের জন্যে না।

তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্ফটিক গুহা দেখাতে নিয়ে গেলাম। সারা পৃথিবীতে সত্তুরটির মত স্ফটিক গুহা আছে। সেই সত্তুরটির মধ্যে যাটটিই পড়েছে সাউথ ডাকোটায়।

পাঁচ ডলারের টিকিট কেটে আমরা স্ফটিক গুহায় ঢুকলাম। সে এক ভয়াবহ সৌন্দর্য। লক্ষ লক্ষ স্ফটিক ঝলমল করছে। প্রকৃতি যেন পাথরের ফুল ফুটিয়েছে। বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রোওজি মুগ্ধকণ্ঠে বলল, আহ্, কি সুন্দর!

আবদাল বলল, ন্যাকামি করবে না। তোমার ন্যাকামি অসহ্য। পাথর আগে দেখনি? পাথর দেখে আহ্ কি সুন্দর বলে নেচে ওঠার কি আছে? ন্যাকামি না করলে ভাল লাগে না?

রোওজির মনটা খারাপ হল। আমারো মন খারাপ হল। এদের সঙ্গে না এলেই

ভাল হত। কিছুক্ষণ পরপর একটি মেয়ে অকারণে অপমানিত হচ্ছে, এই দৃশ্য সহ্য করাও মুশকিল।

মেয়েটি মনে হচ্ছে স্বামীর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। খানিকক্ষণ মন খারাপ করে থাকে। তারপর আবার আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। গুহা থেকে বেরুবার পর গুহার কেয়ারটেকার বলল, কেমন দেখলে?

আমি বললাম, অপূর্ব।

আবদাল বলল, বোগাস! পাথর দেখিয়ে ডলার রোজগার। শাস্তি হওয়া উচিত।

কেয়ারটেকার বলল, স্ফটিক গুহা তোমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে আছে পেট্রিফায়েড ফরেস্ট। পুরো অরণ্য পাথর হয়ে গেছে। ঐটি দেখ।

আবদাল বলল, আমি আর দেখাদেখির মধ্যে নেই।

তাকে ছেড়ে গেলে সে আবার কোন একটা পাব-এ ঢুকে পড়বে। আমাদের আর বাড়ি ফেরা হবে না। কাজেই জোর করেই তাকে ধরে নিয়ে গেলাম। দেখলাম পেট্রিফায়েড ফরেস্ট। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! গাছপালা, পোকামাকড় সবই পাথর হয়ে গেছে। এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার যে প্রকৃতিতে ঘটতে পারে তা-ই আমার মাথায় ছিল না। আমি আবদালকে বললাম, কেমন দেখলে?

সে বলল, দূর, দূর।

পেট্রিফায়েড ফরেস্টে ছোট একটা দোকানের মত আছে। সেখানে স্যুভেনির বিক্রি হচ্ছে। পাথর হওয়া পোকা, পাথর হওয়া গাছের পাতা। কোনটার দাম কুড়ি ডলার, কোনটির পঁচিশ।

রোওজি ক্ষীণস্বরে তার স্বামীকে বলল, সে একটা পোকা কিনতে চায়। তার খুব শখ।

আবদাল চোখ লাল করে বলল, খবর্দার, এই কথা দ্বিতীয়বার বলবে না। পোকা কিনবে কুড়ি ডলার দিয়ে? ডলার খরচ করে কিনতে হবে পোকা?

'পাথরের পোকা।'

'পাথরেরই হোক আর কাঠেরই হোক। পোকা হল পোকা। ভুলেও কেনার নাম মুখে আনবে না।'

'অদ্ভুত এই ব্যাপার কি তোমার কাছে মোটেও ভাল লাগছে না?'

'ভাল লাগার কি আছে? আমার বমি করে ফেলার ইচ্ছা হচ্ছে। তোমরা ঘুরে বেড়াও। আমি সুভ্যেনির দোকানে গিয়ে বসি। ওদের কাছে বিয়ার পাওয়া যায় কি-না কে জানে।'

আমরা ঘণ্টাখানিক ঘুরলাম। রোওজি বলল, চলুন ফেরা যাক। ও আবার দেরি হলে রেগে যাবে।

আবদাল রেগে টং হয়ে আছে। আমাকে দেখেই বলল, কুৎসিত একটা জায়গা। বিয়ার পাওয়া যায় না। চল তো আমার সঙ্গে, একটা পাব খুঁজে বের করি। ওরা এখানে থাকুক। আমি বললাম, না খেলে হয় না? আবদাল অবাক হয়ে বলল, বিয়ার না খেলে বাঁচব কিভাবে?

আমি আবদালকে নিয়ে পাবের সন্ধানে বের হলাম। যাবার আগে সে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কয়েকটা হুংকার দিল, খবর্দার, কিছু কিনবে না। পোকা-মাকড় বাসায় নিয়ে গেলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। চুলের মুঠি ধরে গেট আউট করে দেব।

পাবে দু'জন মুখোমুখি বসলাম।

আবদাল বলল, আমি তোমাকে আলাদা নিয়ে এসেছি একটা গোপন কথা বলার জন্যে।

'গোপন কথাটা কি?'

'রোওজির জন্যে কিছু পাথরের পোকা-মাকড় কিনেছি। আমি সেসব তাকে দিতে পারি না। তুমি দেবে। তুমি বলবে যে, তুমি কিনে উপহার দিচ্ছ।'

আমি তাকিয়ে আছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

আবদাল বলল, আমি আমার স্ত্রীকে পাগলের মত ভালবাসি। কিন্তু ব্যাপারটা তাকে জানতে দিতে চাই না। জানলেই লাই পেয়ে যাবে। এই কারণেই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি।

'ও আচ্ছা।'

'মেয়েটা যে কত ভাল তা তুমি দূর থেকে বুঝতে পারবে না।'

'তুমি লোকটাও মন্দ না।'

'আমি অতি মন্দ। ইবলিশ শয়তানের কাছাকাছি। সেটা কোন ব্যাপার না। দুনিয়াতে ভাল-মন্দ দু'ধরনের মানুষই থাকে। থাকে না?'

'হ্যাঁ, থাকে।'

'এখন তুমি কি আমার স্ত্রীকে এইসব পোকা-মাকড়গুলি উপহার হিসেবে দেবে?'

'তুমি চাইলে অবশ্যই দেব। কিন্তু আমার ধারণা, তোমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে — এইসব উপহার আসলে তোমারই কেনা।'

'না, বুঝতে পারবে না। আমি আমার ভালবাসা সব সময় আড়াল করে রেখেছি। ওর ধারণা হয়ে গেছে, ওকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

'এতে লাভটা কি হচ্ছে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

'লাভটা বলি — কোন একদিন রোওজি হঠাৎ করে সবকিছু বুঝতে পারবে — বুঝতে পারবে আমার সবই ছিল ভান। তখন কি গভীর আনন্দই না পাবে। আমি সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছি।'

আবদাল বিয়ারের অর্ডার দিয়েছে। দু' জগ ভর্তি বিয়ার। নিমিষের মধ্যে একটা জগ শেষ করে সে বলল, জিনিসটা মন্দ না।

আমরা আবার পেট্রিফায়েড ফরেস্টে ফিরে গেলাম। রোওজি ক্ষীণস্বরে তার স্বামীকে বলল, সে ছোট একটা গোবরে পোকা কিনতে চায়। কি সুন্দর জিনিস! আবদাল চোখ লাল করে বলল, আবার! আবার ন্যাকামি ধরনের কথা?

আমরা প্রস্তরীভূত অরণ্য দেখে ফিরে যাচ্ছি। আবদাল ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। মাতাল অবস্থায় সে আসলেই ভাল গাড়ি চালায়। পেছনের সীটে বিমর্ষ মুখে রোওজি বসে আছে। কারণ গাড়িতে উঠার সময় সে আবদালের কাছ থেকে একটা কঠিন ধমক খেয়েছে।

উৎসব

ঈদের আগের দিন বিকেলে আমাদের বাসায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। বেশ বড় রকমের দুর্ঘটনা। আমার মেয়ের ঈদের জামাটা তার এক বান্ধবী দেখে ফেললো। দেখার কোন সম্ভাবনা ছিলো না। বাক্সে তালাবন্ধ করে একটা কাগজের প্যাকেটে মুড়ে রাখা হয়েছিলো। কপাল খারাপ থাকলে যা হয় — বোতাম লাগাবার জন্যে জামা বের করা হয়েছে ওমনি বান্ধবী এসে হাজির। আমার মেয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার জামা লুকাতে পারলো না। সে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলো — জামা পুরানো হয়ে গেছে। জামা পুরানো হয়ে গেছে।

সবকিছুই পুরানো করা চলে। ঈদের জামা জুতো তো পুরানো করা চলে না। জুতোর প্যাকেটটি বুকের কাছে নিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জামাটা খুব কম করে হলেও পাঁচবার ইস্ত্রি করতে হয়। এবং দিনের মধ্যে অন্তত তিনবার বাক্স খুলে দেখতে হয় সব ঠিক আছে কি না। কিন্তু অন্য কেউ দেখে ফেললেই সর্বনাশ। ঈদের আনন্দের পনেরো আনাই মাটি।

বান্ধবী জামা দেখে ফেলেছে এই দুঃখে আমার মেয়ে যখন কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেললো, তখন বললাম, চল যাই আরেকটা কিনে দেব। রাত দশটায় তাকে নিয়ে জামা কিনতে বেরুলাম। চারদিকে কি আনন্দ ! কি উল্লাস ! শিশুদের হাতে বেলুন। মায়েদের মুখভর্তি হাসি। হাতে কেনাকাটার ফর্দ। বাবারা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছেন।

আগে যেসব ছোট ছোট শিশু শুকনো মুখে পলিথিনের ব্যাগ বিক্রি করতো, তারা আজ খুব হাসছে। খুব বিক্রি হচ্ছে ব্যাগ। এক ভদ্রলোককে দেখলাম তিনটি ব্যাগ কিনলেন। তিন টাকা দাম। তিনি একটা কচকচে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, যা দু'টাকা তোর বকশিশ। ছোট বাচ্চাটি পাঁচ টাকার নোটটি নিশানের মত এক হাতে উঁচু করে ধরে ছুটে চলে গেলো।

আমার মনে হলো আজ রাতে কোথাও কোন দুঃখ নেই। আজ কোন স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া হবে না। প্রেমিকারা আজ সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখবে ভুলে-যাওয়া প্রেমিকদের। একজন ভিখিরিও হয়ত তার বহুদিনের শখ মেটানোর জন্যে দেড় টাকা খরচ করে একটা ৫৫৫ সিগারেট কিনে ফেলবে। উড়ির চরে আজ রাতে কোন বৃষ্টি হবে না। শিশুদের আনন্দ আমাদের সব দুঃখ ঢেকে ফেলবে।

বাস্তব অবশ্যই অন্যরকম। অনেক বাড়িতে অন্য সব রাতের মত আজ রাতেও হাঁড়ি চড়বে না। উপোসী ছেলেমেয়েরা মুখ কালো করে ঘুরঘুর করবে। যাদের বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে, তাদের দুঃখও কি কম? হয়তো কারোর একটি ছোট ছেলে ছিল, আজ সে নেই। সে তার বাবা মা'র কাছে নতুন শার্ট-প্যান্টের বায়না ধরেনি। ঘুমুতে যাবার সময় মাকে জড়িয়ে ধরে বলেনি, আম্মা, খুব ভোরে ডেকে দিও। আজ রাত ঐ পরিবারটির বড় দুঃখের রাত। বাবা-মা আজ রাতে তাদের আদরের খোকনের ছবি বের করবেন। শূন্য ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখবেন। এখনো খোকনের ছোট্ট জুতো জোড়া সাজানো, তার ছোট্ট শার্ট, ছোট্ট প্যান্ট আলনায় ঝুলছে। শুধু সে নেই। আগামীকাল ভোরে হৈ-হৈ করে সে ঘর থেকে বেরুবে না।

ঈদের নামাজ পড়লাম নিউ মার্কেটের মসজিদে। ফিরবার পথে দেখি আজিমপুর কবরস্থানের গেট খুলে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে। একজন বাবা তার তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কবরস্থানে এসেছেন। ছেলেমেয়েদের গায়ে ঝলমলে পোশাক। ওরা একটি কবরের পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবরটির উপরে একটি ময়লা কাগজ পড়ে ছিলো। বড় মেয়েটি সে কাগজটি তুলে ফেলে গভীর মমতায় কবরের গায়ে হাত রাখলো। বাবাকে দেখলাম রুমাল বের করে চোখ মুছছেন। এটি কার কবর? বাচ্চাগুলির মার? আজকের এই আনন্দের দিনে এই মা ফিনি রান্না করেননি। গভীর মমতায় শিশুদের নতুন জামা পরিয়ে দেননি। নতুন শাড়ি পরে তিনি আজ আর লজ্জিত ভঙ্গিতে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেননি -- কি, তোমাকেও সালাম করতে হবে নাকি?

আসলে আমাদের সবচে' দুঃখের দিনগুলিই হচ্ছে উৎসবের দিন।*

---

* এই লেখাটা ঈদের লেখা হিসেবে দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়। তার কিছুদিন পর আমার ছোট ছেলেটি মারা যায়। আমি অবিকল এই রচনাটির মত আমার তিনটি বাচ্চা এবং স্ত্রীকে নিয়ে ঈদের দিন আমার বাচ্চাটির কবর দেখতে যাই। আমার বাচ্চারা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে . . .।

উমেশ

উমেশের সঙ্গে আমার পরিচয় নর্থ ডাকোটার ফার্গো সিটিতে। মাদ্রাজের ছেলে। বানরের মত চেহারা। স্বভাব-চরিত্রও বানরের মত — সারাক্ষণ তিড়িং-বিড়িং করছে। গলা খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলছে। হাসেও বিচিত্র ভঙ্গিতে খিক্ খিক্ করে, থেমে থেমে শব্দ হয়, সমস্ত শরীর তখন বিশ্রীভাবে দুলতে থাকে।

সে এসেছে জৈব রসায়নে M.S. ডিগ্রী নিতে। আমি তখন পড়াশোনার পাট শেষ করে ফেলেছি। একটা ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার কিনেছি, দিন-রাত খট্‌খট্ শব্দে থিসিস টাইপ করি। একেএকটা চ্যাপ্টার লেখা শেষ হয়, আমি আমার প্রফেসরের কাছে নিয়ে যাই। তিনি পড়েন এবং হাসিমুখে বলেন, অতি চমৎকার হয়েছে। তুমি এই চ্যাপ্টারটা আবার লেখ।

আমি হতাশ হয়ে বলি, অতি চমৎকার হলে নতুন করে লেখার দরকার কি? প্রফেসরের মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হয়। তিনি বলেন, অতি চমৎকার তো শেষ কথা নয়। অতি চমৎকারের পরে আছে অতি অতি চমৎকার। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার লিখতে বসি। এই সময়ে উমেশের আবির্ভাব হল মূর্তিমান উপদ্রবের মত। তার প্রধান কাজ হল 'আবে ইয়ার' বলে আমার ঘরে ঢুকে পড়া। এবং আমাকে বিরক্ত করা।

আমেরিকায় সে পড়াশোনা করার জন্যে আসেনি। তার মূল উদ্দেশ্য সিটিজেনশীপ। অন্য কোনভাবে আমেরিকা আসার ভিসা পাওয়া যাচ্ছিল না বলেই সে স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছে। এখন তার দরকার — 'সবুজপত্র' বা গ্রীনকার্ড। ঐ বস্তু কি করে পাওয়া যায় সেই পরামর্শ করতেই সে আমার কাছে আসে।

আমি প্রথম দিনেই তাকে বলে দিলাম, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। জানার আগ্রহও বোধ করিনি। আমি এসেছি পড়াশোনা করতে। ঐ পর্ব শেষ

হয়েছে, এখন দেশে চলে যাব। উমেশ চোখ-মুখ কুঁচকে 'আরে বুরবাক . . . ' শব্দ দু'টি দিয়ে একগাদা কথা বলল, যার কিছুই আমি বুঝলাম না। হিন্দী আমি বুঝতে পারি না। তাছাড়া উমেশ কথা বলে দ্রুত। তবে তার মূল বক্তব্য ধরতে অসুবিধা হল না। মূল বক্তব্য হচ্ছে — হুমায়ুন, তুমি মহা বুরবাক। এমন সোনার দেশ ছেড়ে কেউ যায়?

কাজের সময় কেউ বিরক্ত করলে আমার অসহ্য বোধ হয়। এই কথা আমি উমেশকে বুঝিয়ে বললাম। সে বিস্মিত হয়ে বলল, আমি তো বিরক্ত করছি না। চুপচাপ বসে আছি। তুমি তোমার কাজ কর।

সে চুপচাপ মোটেও বসে থাকে না। সারাক্ষণ তিড়িং-বিড়িং করে। এই বসে আছে, এই লাফ দিয়ে উঠছে। তাছাড়া তার শিস দিয়ে গান গাওয়ার শখও আছে। সে শিস দিয়ে নানান ধরনের সুর তৈরির চেষ্টা করে। সেই সুরের তালে পা নিজেই মুগ্ধ হয়ে নাচায়।

সব মানুষের জীবনেই কিছু উপগ্রহ জুটে যায়। উমেশ হল আমার উপগ্রহ। সে জৈব রসায়নের তিনটা কোর্স নিয়েছে। এর মধ্যে একটা ল্যাব কোর্স। কাজ করে আমার ঘরের ঠিক সামনের ঘরে। কাজ বলতে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা, ধোয়াধুয়ি করা, তারপর আমার সামনে এসে বসে থাকা। পা নাচানো এবং শিস দেয়া। আমি তাকে বললাম, কোর্স যখন নিয়েছ মন দিয়ে কোর্সগুলি করা দরকার। তুমি তো সারাক্ষণ আমার সামনে বসেই থাক।

সে হাসিমুখে বলল, M.S. ডিগ্রীর আমার কোন শখ নেই। আমার দরকার সিটিজেনশীপ। স্টুডেন্ট ভিসা যাতে বজায় থাকে এই জন্যেই কোর্স নিলাম। পড়াশোনা করে হবেটা কি ছাতা?

আমি বললাম, অনেক কিছুই হবে। একটা আমেরিকান ডিগ্রী পেলে এ দেশে চাকরি পেতে তোমার সুবিধা হবে। চাকরি পেলে গ্রীনকার্ড পাবে।

'আবে ইয়ার — সাচ বাত।'

উমেশকে এই উপদেশ দেয়ার মূল কারণ অন্য। আমি চাচ্ছিলাম তাকে পড়াশোনায় ব্যস্ত করে তুলতে, যাতে সে আমাকে মুক্তি দেয়। সিন্দাবাদের ভূতের মত সে কেন আমার উপর ভর করল কে জানে! এমন না যে, এই নর্থ ডাকোটায় আমিই একমাত্র কাল চামড়া। কাল চামড়া প্রচুর আছে। ভারতীয় ছাত্রই আছে দশ-বার জন। অনেকে পরিবার নিয়ে আছে। নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটির ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন বেশ বড় এসোসিয়েশন। তারা প্রতিমাসেই টিকিট কেটে হিন্দী ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করে। দোল উৎসব হয়। এর বাড়ি, ওর বাড়ি পার্টি

লেগে থাকে। উমেশ ওদের সঙ্গে থাকতে পারে। তা কেন সে থাকছে না? কেন চেপে আছে আমার কাঁধে?

যে কোন কারণেই হোক তার ধারণা হয়েছে, এই বিদেশে আমিই তার সবচে' নিকটজন। কাজেই আমার সময় নষ্ট করার পূর্ণ অধিকার তার আছে। একদিন না পেরে তাকে কফিশপে নিয়ে কফি খাওয়ালাম এবং শীতল গলায় বললাম, উমেশ, একটা কথা শুনলে তোমার হয়ত খারাপ লাগবে, তবু কথাটা তোমাকে বলা দরকার।

'বল।'

'আমি তোমাকে খুবই অপছন্দ করি।'

উমেশ বলল, কেন, আমার চেহারা খারাপ বলে?

আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না। উমেশ বলল, আমার চেহারা খুব খারাপ তা আমি জানি। স্কুলে আমার নাম ছিল 'ছোটে হনুমান'। কিন্তু চেহারা তো বন্ধুত্বের অন্তরায় হতে পারে না। ভুল বলেছি?

'না, ভুল বলনি।'

'আমি তোমাকে খুব বিরক্ত করি তা আমি জানি। কি করব বল, আমার ভাল লাগে না। ল্যাবে কাজ করতে ভাল লাগে না। পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না।'

'আমার সামনে বসে শিস দিয়ে গান গাইতে ভাল লাগে?'

'হুঁ।'

'শোন উমেশ। আমি একা একা কাজ করতে পছন্দ করি। তুমি যে আমার সামনে বসে থাক, এতে আমার কাজ করতে অসুবিধা হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'আমাকে থিসিস লেখার কাজটা দ্রুত শেষ করতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি যদি আর আমাকে বিরক্ত না কর তাহলে ভাল হয়।'

উমেশ কফির মগ হাত দিয়ে সরিয়ে উঠে চলে গেল। একবার ফিরেও তাকালো না। আমার খানিকটা খারাপ লাগলেও মুক্তির নিশ্বাস ফেললাম। আসলেই মুক্তি পেয়েছি কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না।

মুক্তি পেলাম। উমেশ আর আমার ঘরে আসে না। তার সঙ্গে দেখা হলে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। আমার সামনের ল্যাবে সে রোজই আসে। একা একা কাজ করে। করিডোরে দাঁড়িয়ে উদাস মুখে সিগারেট খায়। আমার সাড়া পেলে চট করে ল্যাবে ঢুকে যায়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এতটা কঠিন না হলেও পারতাম।

মাসখানিক পরের কথা। নিজের ঘরে বসে কাজ করছি। হঠাৎ ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠল। আমি বিচলিত হলাম না। এখানে কিছুদিন পরপর ফায়ার ড্রিল হয়। অ্যালার্ম বেজে উঠে। তখন ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে মাঠে দাঁড়াতে হয়। ফায়ার মার্শাল আসেন — পরীক্ষা করে দেখেন জরুরি অবস্থায় সব ঠিকঠাক থাকবে কি-না। আজও নিশ্চয়ই তেমন কিছু হচ্ছে। আমি বিরক্ত মুখে ঘর থেকে বের হলাম। অকারণে খোলামাঠে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রচণ্ড শীতে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কোন সুখকর অভিজ্ঞতা নয়।

করিডোরে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। কারণ আজকেরটা ফায়ার ড্রিল নয়। পালে বাঘ পড়েছে। এবার সত্যি সত্যি আগুন লেগেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হচ্ছে উমেশের ল্যাব থেকে। সাদা ও কালো ধোঁয়ার জটিল মিশ্রণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উমেশ।

আমি আতংকে জমে গেলাম। ল্যাবে আগুন মানেই ভয়াবহ ব্যাপার। প্রচুর দাহ্যবস্তুতে ল্যাব থাকে ভর্তি। বোতলে ভরা থাকে ফসফরাস। জার ভর্তি তীব্র গাঢ়ত্বের এসিড। আছে নানান ধরনের অক্সিডাইজার। এরা মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে দেবে। ল্যাব অগ্নিকাণ্ড সব সময়ই ভয়াবহ হয়। প্রায়ই দেখা যায় এইসব ক্ষেত্রে শুধু ল্যাব নয়, পুরো বিল্ডিং উড়ে যায়।

আমি লক্ষ করলাম, আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে তীব্র আতংক। বিল্ডিং-এর বৈদ্যুতিক দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার নিজেরও ইচ্ছা হল ছুটে বের হয়ে যাই। কিন্তু ল্যাবে উমেশ একা। সে গরুর মত বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি চিৎকার করে বললাম, দেখছ কি, বের হয়ে আস।

উমেশ বিড়বিড় করে বলল, নড়তে পারছি না।

উমেশের কি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম। তীব্র আতংকে রিগরাস মর্টিসের মত হয়। শরীরের সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। মানুষের নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না।

আমি চিরকালের ভীতু মানুষ। কিন্তু সেদিন অসীম সাহসের কিংবা অসীম বোকামির পরিচয় দিয়ে ল্যাবে ঢুকে পড়লাম। প্রথম চেষ্টা করলাম উমেশকে টেনে বের করতে। পারলাম না — তার শরীর পাথরের মত ভারি। উমেশ বলল, তুমি থেকো না। তুমি বের হও। এক্ষুনি এক্সপ্লোশন হবে।

প্রাণী হিসেবে মানুষের অবস্থান আসলেই অনেক উপরে। আমি এই অসহায় ছেলেটিকে একা ফেলে রেখে বের হতে পারলাম না। আমার বুকের ভেতর থেকে কেউ-একজন বলল, না, তা তুমি পার না। অথচ বাসায় আমার স্ত্রী আছে। ছোট

ছোট দু'টি মেয়ে — নোভা, শীলা। ছোট মেয়েটি সবে কথা শিখেছে। তাদের কথা মনে পড়ল না। প্রচণ্ড বিপদে আল্লাহকে ডাকতে হয়। সুরা পড়তে হয়। আমার কোন সুরা মনে পড়ছে না।

বিল্ডিং-এর ইলেকট্রিক লাইন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পুরো বিল্ডিং অন্ধকার। আগুনের হল্‌কায় অস্পষ্টভাবে সবকিছু চোখে আসছে। আমি চলে গিয়েছি এক ধরনের ঘোরের মধ্যে। হুস করে বড় একটা আগুন ধরল। তার আলোয় চোখে পড়ল, দেয়ালে বিরাট একটা কেমিক্যাল ফায়ার এক্সটিংগুইসার। সাধারণত ল্যাবের আগুনে এদের ব্যবহার করতে হয়। কিভাবে এদের ব্যবহার করতে হয় তাও জানি না। গায়ে বড় বড় অক্ষরে নির্দেশনামা আছে। চেষ্টা করা যাক। আমি ছুটে গেলাম ফায়ার এক্সটিংগুইসারের দিকে। নির্দেশ নাম্বার ওয়ান — বড় লিভারটি টেনে নিচে নামাও। কোনটি বড় লিভার? দু'টিই তো এক রকম লাগছে। নির্দেশ নাম্বার দুই — ছোট লিভারটির কাউন্টার ক্লক ঘুরাও। কাউন্টার ক্লক মানে কি? ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিক? ঘড়ির কাঁটা কোনদিকে ঘুরে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফায়ার এক্সটিংগুইসার চালু করতে পারলাম। এই অদ্ভুত যন্ত্রটি মুহূর্তের মধ্যে পুরো ল্যাব সূক্ষ্ম সাদা ফেনায় ঢেকে দিল। আমরা ডুবে গেলাম ফেনার ভেতর। আগুন নিভে গেল। তারো মিনিট দশেক পর ফায়ার সার্ভিসের মুখোশ পরা লোকজন আমাদের দুজনকে উদ্ধার করল। উমেশকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। তার কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না। জিহ্বাও শক্ত হয়ে গেছে।

উমেশকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম, সে আমাকে দেখে আনন্দিত হবে। তা হল না। মুখ কালো করে বলল, তুমি কেন এসেছ? তুমি তো আমাকে দেখতে পার না। আমি শুধু তোমাকে বিরক্ত করি। তুমি চলে যাও।

আমি হাসলাম।

উমেশ হাসল না। চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। সে আসলেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

সে যে আমার ব্যবহারে কি রকম আহত হয়েছিল তা বুঝলাম যখন দেখলাম -- তাকে আগুন থেকে উদ্ধারের মত ঘটনাতেও সে অভিভূত হয়নি। আমাকে দেখলে আগের মতই চোখ ফিরিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়। সে নর্থ ডাকোটা থেকে চলে গেল মুরহেড স্টেটে। যাবার আগের দিন আমাকে একটা খামবন্ধ চিঠি দেয়া হল। চিঠিটি তার লেখা না। তার বাবার লেখা। ভদ্রলোক লিখেছেন —

জনাব,

আপনি আমার মা-হারা পুত্রের জীবন রক্ষা করেছেন। এর প্রতিদান আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর আপনাকে তার প্রতিদান দেবেন। ঈশ্বর কোন সৎকর্ম অবহেলা করেন না। উমেশ লিখেছে, আপনি তার জন্যে আপনার জীবন বিপন্ন করেছেন। আপনার থিসিসের কাগজপত্র আগুনে নষ্ট হয়েছে। আপনাকে আবার নতুন করে লিখতে হয়েছে। আমি নিজে একজন পাপী মানুষ। পাপী মানুষের প্রার্থনায় ফল হয় না, তবু আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে আপনার জন্যে প্রার্থনা করি। যতদিন বাঁচব, করব। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আমেরিকার পর্ব শেষ করে দেশে ফিরছি। হেক্টর এয়ারপোর্টে অনেকেই আমাকে বিদায় দিতে এসেছে। হঠাৎ দেখি দূরে উমেশ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই সে চোখ নামিয়ে নিল। দ্রুত চলে গেল ভেন্ডিং মেশিনের আড়ালে। আমি এগিয়ে গেলাম।

উমেশ বলল, আমি তো তোমাকে বিদায় দিতে আসিনি। আমি যাব লস এঞ্জেলস। তার টিকিট কাটতে এসেছি।

'ঠিক আছে। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হল। খুব ভাল লাগছে। একদিন তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। তার জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। প্লেনে ওঠার আগে তোমার হাসিমুখ দেখে যেতে চাই।'

উমেশ বলল, আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি আসলে তোমাকে বিদায় দিতেই এসেছি।

উমেশ আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

প্লেনে ওঠার আগে সিকিউরিটি চেকিং-এ যাচ্ছি। বন্ধু-বান্ধবরা হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। রুমাল উড়াচ্ছে। শুধু উমেশ দু'হাতে তার মুখ ঢেকে আছে। সে তার কান্নায় বিকৃত মুখ কাউকে দেখাতে চাচ্ছে না।

সে

এরশাদ সাহেবের সময়কার কথা। সরকারি পর্যায়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে। আমার কাছে জানতে চাওয়া হল আমি সেই উৎসবে যোগ দেব কি-না।

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে কোন নিমন্ত্রণে আমি আছি। এরশাদ সাহেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠান হচ্ছে, হোক না, আমি কোন সমস্যা দেখছি না। রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসার অধিকার সবারই আছে।

যথাসময়ে শিলাইদহে উপস্থিত হলাম। কুঠিবাড়িতে পা দিয়ে গায়ে রোমাঞ্চ হল। মনে হল পবিত্র তীর্থস্থানে এসেছি। এক ধরনের অস্বস্তিও হতে লাগল, মনে হল — এই যে নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। চারদিকে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলা ছড়িয়ে আছে। কবির কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনা মিশে আছে প্রতি ধূলিকণায়। সেই ধুলার উপর দিয়ে আমি হেঁটে যাব, তা কি হয়? এত স্পর্ধা কি আমার মত অভাজনের থাকা উচিত?

নিজের মনে ঘুরে বেড়াতে এত ভাল লাগছে। কুঠিবাড়ির একটা ঘরে দেখলাম কবির লেখার চেয়ার টেবিল। এই চেয়ারে বসেই কবি কত-না বিখ্যাত গল্প লিখেছেন। কুঠিবাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ল কবির প্রিয় নদী প্রমত্তা পদ্মা। ১২৯৮ সনের এক ফাল্গুনে এই পদ্মার দুলুনি খেতে খেতে বজরায় আধশোয়া হয়ে বসে কবি লিখলেন,

শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

একদিকে উৎসব হচ্ছে, গান, কবিতা আলোচনা, অন্যদিকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজের মনে। সন্ধ্যাবেলা কুঠিবাড়িতে গানের অনুষ্ঠানে আমি নিমন্ত্রিত অতিথি, উপস্থিত না থাকলে ভাল দেখায় না বলে প্যান্ডেলের নিচে গিয়ে বসেছি। শুরু হল বৃষ্টি, ভয়াবহ বৃষ্টি। সেই সঙ্গে দমকা বাতাস। বাতাসে সরকারি প্যান্ডেলের অর্ধেক উড়ে গেল। আমি রওনা হলাম পদ্মার দিকে। এমন ঝমঝমে বৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই ভিজতেন। আমি যদি না ভিজি তাহলে কবির প্রতি অসম্মান করা হবে।

বৃষ্টিতে ভেজা আমার জন্য নতুন কিছু না। কিন্তু সেদিনকার বৃষ্টির পানি ছিল বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। আর হাওয়া? মনে হচ্ছে সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসছে। আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। নব ধারা জলে স্নানের আনন্দ ধুয়ে-মুছে গেছে। রেস্ট হাউসে ফিরে শুকনো কাপড় পরতে পারলে বাঁচি।

কাঁপতে কাঁপতে ফিরছি। পদ্মা থেকে কুঠিবাড়ি অনেকটা দূর। কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টির পানিতে সেই রাস্তা কাদা হয়ে গেছে। দ্রুত হাঁটা যাচ্ছে না। জায়গাটাও অন্ধকার। আধাআধি পথ এসে থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন রাস্তার পাশে গাছের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক আলো করে বিদ্যুৎ চমকালো। আর তখনি আমার সারা শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, গাছের নিচে যুবক বয়সের রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন। এটা কি কোন মায়া? কোন ভ্রান্তি? বিচিত্র কোন হেলুসিনেশন? আমার চিন্তা-চেতনা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলেই তাঁকে দেখছি?

আমি চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ছায়ামূর্তি বলল, কে, হুমায়ূন ভাই না?

নিজেকে চট করে সামলে নিলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই আমাকে হুমায়ূন ভাই বলবে না। আমি ভৌতিক কিছু দেখছি না। এমন একজনকে দেখছি যে আমাকে চেনে, এবং যাকে অন্ধকারে খানিকটা রবীন্দ্রনাথের মত দেখায়। ছায়ামূর্তি বলল, হুমায়ূন ভাই, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কোথায় যাচ্ছেন?

আমি বললাম, কুঠিবাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমি কি আপনাকে চিনি?

'জ্বি না, আপনি আমাকে চেনেন না। হুমায়ূন ভাই, আমি আপনার অনেক ছোট। আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'তোমার নাম কি?'

'রবি।'

'ও আচ্ছা, রবি।'

আমি আবার বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। নাম রবি মানে? হচ্ছেটা কি?

রবি বলল, চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

'চল।'

ভিজতে ভিজতে আমরা কুঠিবাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঝড়ের প্রথম ঝাপটায় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল, এখন আবার এসেছে। চারদিকে আলো ঝলমল করছে। আলোতে আমি আমার সঙ্গীকে দেখলাম, এবং আবারো চমকালাম। অবিকল যুবক বয়সের রবীন্দ্রনাথ। আমি বললাম, তোমাকে দেখে যে আমি বারবার চমকাচ্ছি তা কি তুমি বুঝতে পারছ?

'পারছি। আপনার মত অনেকেই চমকায়। তবে আপনি অনেক বেশি চমকাচ্ছেন।'

'তোমার নাম নিশ্চয়ই রবি না?'

'জ্বি না। যারা যারা আমাকে দেখে চমকায় তাদের আমি এই নাম বলি।'

'এসো, আমরা কোথাও বসে গল্প করি।'

'আপনি ভেজা কাপড় বদলাবেন না? আপনার তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'লাগুক ঠাণ্ডা।'

আমরা একটা বাঁধানো আমগাছের নিচে গিয়ে বসলাম। রবি উঠে গিয়ে কোত্থেকে এক চা-ওয়ালাকে ধরে নিয়ে এল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। আমি আধভেজা সিগারেট ধরিয়ে টানছি। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। সেই চা-ও বৃষ্টির পানির মতই ঠাণ্ডা। খুবই লৌকিক পরিবেশ। তারপরেও আমি লক্ষ্য করলাম, আমার বিস্ময়বোধ দূর হচ্ছে না।

রবি হাসিমুখে বলল, হুমায়ুন ভাই। আমি শুনেছিলাম আপনি খুব সিরিয়াস ধরনের মানুষ। আপনি যে বাচ্চাদের মত বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করেন তা ভাবিনি। আপনাকে দেখে আমার খুব মজা লেগেছে।

আমি বললাম, তোমাকে দেখে শুরুতে আমার লেগেছিল ভয়। এখন লাগছে বিস্ময়।

'আপনি এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন? মানুষের চেহারার সঙ্গে মানুষের মিল থাকে না?'

'থাকে, এতটা থাকে না।'

রবির সঙ্গে আমার আরো কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল। সম্ভব হল না। সরকারি বাস কুষ্টিয়ার দিকে রওনা হচ্ছে। বাস মিস করলে সমস্যা। রবি আমার সঙ্গে এল না। সে আরো কিছুক্ষণ থাকবে। পরে রিকশা করে যাবে। তবে সে যে ক'দিন অনুষ্ঠান চলবে, রোজই আসবে। কাজেই তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ

রয়ে গেল।

রাতে রেস্ট হাউসে ফিরে আমার কেন জানি মনে হল পুরো ব্যাপারটাই মায়া। ছেলেটির সঙ্গে আর কখনোই আমার দেখা হবে না। রাতে ভাল ঘুমও হল না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! পরদিন সত্যি সত্যি ছেলেটির দেখা পেলাম না। অনেক খুঁজলাম। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, দেখতে অবিকল রবীন্দ্রনাথের মত এমন একজনকে দেখেছেন?

তারা সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি কিছুক্ষণ আগেই গাঁজা খেয়ে এসেছি। ঐ জিনিস তখন কুঠিবাড়ির আশেপাশে খাওয়া হচ্ছে। লালন শাহ্-র কিছু অনুসারী এসেছেন। তাঁরা গাঁজার উপরই আছেন। উৎকট গন্ধে তাঁদের কাছে যাওয়া যায় না। তাঁদের একজন আমাকে হাত ইশারা করে কাছে ডেকে বলছেন, আচ্ছা স্যার, রবিঠাকুর যে লালন শাহ্-র গানের খাতা চুরি করে নবেল পেল এই বিষয়ে জ্ঞসমাজে কিছু আলোচনা করবেন। এটা অধীনের নিবেদন।

তৃতীয় দিনেও যখন ছেলেটার দেখা পেলাম না, তখন নিশ্চিত হলাম, ঝড়-বৃষ্টির রাতে যা দেখেছি তার সবটাই ভ্রান্তি। মধুর ভ্রান্তি। নানান ধরনের যুক্তিও আমার মনে আসতে লাগল। যেমন, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কর?' সে জবাব দেয়নি। আমার সঙ্গে সরকারি বাসে আসতেও রাজি হয়নি। নিজের আসল নামটিও বলেনি।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে দেখি সে প্যান্ডেলের এক কোণায় চুপচাপ বসে আছে। আমি এগিয়ে গেলাম।

'এই রবি, এই।'

রবি হাসিমুখে তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল। আমি বললাম, এই ক'দিন আসনি কেন?

'শরীরটা খারাপ করেছিল। ঐ দিন বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেল।'

'আজ শরীর কেমন?'

'আজ ভাল।'

'এই ক'দিন আমি তোমাকে খুব খুঁজেছি।'

'আমি অনুমান করেছি। আচ্ছা হুমায়ুন ভাই, দিনের আলোতেও কি আমাকে রবীন্দ্রনাথের মত লাগে?'

'হ্যাঁ লাগে, বরং অনেক বেশি লাগে।'

সে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দেখুন মানুষের ভাগ্য! আমি শুধু দেখতে রবীন্দ্রনাথের মত এই কারণে আপনি কত আগ্রহ করে আমার সঙ্গে কথা বলছেন।

'তার জন্য কি তোমার খারাপ লাগছে?'

'না, খারাপ লাগছে না। ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। নিজেকে মিথ্যামিথ্যি রবীন্দ্রনাথ ভাবতেও আমার ভাল লাগে।'

'তুমি টিভিতে কখনো নাটক করেছ?'

'কেন বলুন তো?'

'তোমাকে আমি টিভি নাটকে ব্যবহার করতে চাই।'

'আমি কোনদিন নাটক করিনি কিন্তু আপনি বললে আমি খুব আগ্রহ নিয়ে করব। কি নাটক?'

'এই ধর, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাটক। যৌবনের রবীন্দ্রনাথ। কুঠিবাড়িতে থাকেন। পদ্মার তীরে হাঁটেন। গান লিখেন, গান করেন। এইসব নিয়ে ডকুমেন্টারি ধরনের নাটক।'

'সত্যি লিখবেন?'

'হ্যাঁ লিখব। একটা কাগজে তোমার ঠিকানা লিখে দাও।'

'ঠিকানা আপনি হারিয়ে ফেলবেন। আমি বরং আপনাকে খুঁজে বের করব।'

ছুটির সময়ে মন সাধারণত তরল ও দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ছুটির সময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি পরে আর মনে থাকে না। আমার বেলায় সেরকম হল না। আমি ঢাকায় ফিরেই টিভির নওয়াজিশ আলি খাঁন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। তিনি এক কথায় বাতিল করে দিলেন। তিনি বললেন, রবিঠাকুরকে সরাসরি দেখাতে গেলে অনেক সমস্যা হবে। সমালোচনা হবে। রবীন্দ্র–ভক্তরা রেগে যাবেন। বাদ দিন। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মাস তিনেক পর ছেলেটার সঙ্গে আবার দেখা হল টিভি ভবনে। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল — নাটকটা লিখেছি কি–না। আমি সত্যি কথাটা তাকে বলতে পারলাম না। তাকে বললাম, লিখব লিখব। তুমি তৈরি থাক।

'আমি তৈরি আছি। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'চেহারাটা ঠিক রাখ, চেহারা যেন নষ্ট না হয়।'

আমি টিভির আরো কিছু লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম। কোন লাভ হল না। ছেলেটির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। আমি বলি — হবে হবে, ধৈর্য ধর। এই মিথ্যা আশ্বাস যতবার দেই ততবারই খারাপ লাগে। মনে মনে বলি, কেন বারবার এর সঙ্গে দেখা হয়? আমি চাই না দেখা হোক। তারপরেও দেখা হয়।

একদিন সে বলল, হুমায়ুন ভাই, আপনি কি একটু তাড়াতাড়ি নাটকটা লিখতে পারবেন?

'কেন বল তো?'

'এমনি বললাম।'

'হবে হবে, তাড়াতাড়িই হবে।'

তারপর অনেক দিন ছেলেটির সঙ্গে দেখা নেই। নাটকের ব্যাপারটাও প্রায় ভুলে গেছি। ব্যস্ত হয়ে পড়েছি অন্য কাজে। তখন ১৪০০ সাল নিয়ে খুব হৈচৈ শুরু হল। আমার মনে হল, এ-ই হচ্ছে সুযোগ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাটকটা লিখে ফেলা যাক। নাটকের নাম হবে ১৪০০ সাল। প্রথম দৃশ্যে কবি একা একা পদ্মার পাড়ে হাঁটছেন, আবহ সংগীত হিসেবে কবির বিখ্যাত কবিতাটি (আজি হতে শতবর্ষ পরে . . .) পাঠ করা হবে। কবির মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে একঝাঁক পাখি। কবি আগ্রহ নিয়ে তাকাবেন পাখির দিকে, তারপর তাকাবেন আকাশের দিকে।

দ্রুত লিখে ফেললাম। আমার ধারণা, খুব ভাল দাঁড়াল। নাটকটা পড়ে শুনালে টিভি-র যে কোন প্রযোজকই আগ্রহী হবেন বলে মনে হল। একদিন ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করছি টিভি-র বরকতউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে। পাশে আছেন জিয়া আনসারী সাহেব। তিনি কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, রবিঠাকুরের ভূমিকায় আপনি যে ছেলেটিকে নেবার কথা ভাবছেন তাকে আমি চিনতে পারছি। গুড চয়েস।

আমি বললাম, ছেলেটার চেহারা অবিকল রবিঠাকুরের মত না?

'হ্যাঁ। তবে ছেলেটিকে আপনি অভিনয়ের জন্যে পাবেন না।'

'কেন?'

'ওর লিউকোমিয়া ছিল। অনেক দিন থেকে ভুগছিল। বছরখানিক আগে মারা গেছে।'

আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। গভীর আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে ছেলেটা অপেক্ষা করছিল। তার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। সে কাউকে তা জানতে দেয়নি।

বাসায় ফিরে নাটকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেললাম। এই নাটকটি আমি রবিঠাকুরের জন্যে লিখিনি। ছেলেটির জন্যে লিখেছিলাম। সে নেই, নাটকও নেই।*

---

* ছেলেটির নাম নিয়ে আমি সমস্যায় পড়েছি। নাম মনে করতে পারছি না। ভোরের কাগজের সাংবাদিক জনাব সাজ্জাদ শরিফের ধারণা তার নাম হাফিজুর রশিদ। ডাক নাম রাজু।

নারিকেল-মামা

তাঁর আসল নাম আমার মনে নেই।

আমরা ডাকতাম 'নারকেল-মামা'। কারণ নারিকেল গাছে উঠে নারকেল পেড়ে আনার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পায়ে দড়ি-টরি কিছু বাঁধতে হত না। নিমিষের মধ্যে তিনি উঠে যেতেন। নারকেল ছিঁড়তেন শুধু হাতে। তাঁর গাছে ওঠা, গাছ থেকে নামা, পুরো ব্যাপারটা ছিল দেখার মত। তাঁর নৈপুণ্য যে কোন্ পর্যায়ের তা দেখাবার জন্যেই একদিন আমাকে বললেন, এই পিঠে ওঠ্। শক্ত কইরা গলা চাইপা ধর্। আমি তাই করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে তরতর করে নারকেল গাছের মগডালে উঠে দুই হাত ছেড়ে নানা কায়দা দেখাতে লাগলেন। ভয়ে আমার রক্ত জমে গেল। খবর পেয়ে আমার নানাজান ছুটে এলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, হারামজাদা, নেমে আয়।

এই হচ্ছেন আমাদের নারিকেল-মামা। আত্মীয়তা-সম্পর্ক নেই। নানার বাড়ির সব ছেলেরাই যেমন মামা, ইনিও মামা। আমার নানার বাড়িতে কামলা খাটেন। নির্বোধ প্রকৃতির মানুষ। খুব গরম পড়লে মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। কিংবা কে জানে মাথা হয়ত তাঁর সব সময়ই এলোমেলো । শুধু গরমের সময় অন্যরা তা বুঝতে পারে।

নারিকেল-মামার মাথা এলোমেলো হবার প্রধান লক্ষণ হল — হঠাৎ তাঁকে দেখা যাবে গোয়ালঘর থেকে দড়ি বের করে হনহন করে যাচ্ছেন। পথে কারো সঙ্গে দেখা হল, সে জিজ্ঞেস করল, কই যান্?

নারিকেল-মামা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলবেন, ফাঁস নিব। উঁচা লম্বা একটা গাছ দেইখ্যা ঝুইল্যা পড়ব।

প্রশ্নকর্তা তাতে বিশেষ বিচলিত হয় না। বিচলিত হবার তেমন কারণ নেই। এই দৃশ্য তার কাছে নতুন নয়। আগেও দেখেছে। একবার না, অনেকবার দেখেছে।

প্রশ্নকর্তা শুধু বলে, আচ্ছা যা। একবার জিজ্ঞেসও করে না, ফাঁস নেবার ইচ্ছেটা কেন হল।

তাঁর আত্মহননের ইচ্ছা তুচ্ছ সব কারণে হয়। তাঁকে খেতে দেয়া হয়েছে। ভাত-তরকারি সবই দেয়া হয়েছে। কিন্তু লবণ দিতে ভুলে গেছে। তিনি লবণ চেয়েছেন। যে ভাত দিচ্ছে সে হয়ত শুনেনি। তিনি শান্তমুখে খাওয়া শেষ করলেন। পানি খেলেন। পান মুখে দিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকে গেলেন দড়ির খোঁজে। এই হল ব্যাপার।

সবই আমার শোনা কথা। আমরা বছরে একবার ছুটির সময় নানার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। থাকতাম দশ-পনেরো দিন। এই সময়ের মধ্যে নারিকেল-মামার দড়ি নিয়ে ছোটাছুটির দৃশ্য দেখিনি। তাঁকে আমার মনে হয়েছে অতি ভাল একজন মানুষ। আমাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় তাঁর কোন সীমা ছিল না। একটা গল্পই তিনি সম্ভবত জানতেন। সেই গল্পই আমাদের শোনাবার জন্যে তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। কাঁইক্যা মাছের গল্প।

এক দীঘিতে একই কাঁইক্যা মাছ বাস করত। সেই দীঘির পাড়ে ছিল একটা চাইলতা গাছ। একদিন কাঁইক্যা মাছ চাইলতা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। হঠাৎ একটা চাইলতা তার গায়ে পড়ল। সে দারুণ বিরক্ত হয়ে বলল,

চাইলতারে চাইলতা তুই যে আমায় মাইলি?

উত্তরে চাইলতা বলল,

কাঁইক্যারে কাঁইক্যা, তুই যে আমার কাছে আইলি?

এই হল গল্প। কেনই-বা এটা একটা গল্প, এর মানে কি আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এই গল্প বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে নারিকেল-মামার চোখে পানি এসে যেত। আমি তাঁর কাছে এই গল্প বারবার শুনতে চাইতাম তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্যে।

সেবার রোজার ছুটিতে নানার বাড়ি গিয়েছি। তখন রোজা হত গরমের সময়। প্রচণ্ড গরম। পুকুরে দাপাদাপি করে অনেকক্ষণ কাটাই। আমরা কেউই সাঁতার জানি না। নারিকেল-মামাকে পুকুর পাড়ে বসিয়ে রাখা হয় যাতে তিনি আমাদের দিকে লক্ষ রাখেন। তিনি চোখ-কান খোলা রেখে মূর্তির মত বসে থাকেন। একদিন এইভাবে বসে আছেন। আমরা মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাচ্ছি, হঠাৎ শুনি বড়দের কোলাহল — ফাঁস নিছে। ফাঁস নিছে।

পানি ছেড়ে উঠে এলাম। নারিকেল-মামা নাকি ফাঁস নিয়েছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। নানার বাড়ির পেছনের জঙ্গলে জামগাছের ডালে দড়ি হাতে নারিকেল-মামা বসে আছেন। দড়ির একপ্রান্ত জামগাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। অন্য প্রান্ত তিনি তাঁর

গলায় বেঁধেছেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ার মত ডালের দু'দিকে পা দিয়ে বেশ আয়েশ করে বসে আছেন।

আমরা ছোটরা খুব মজা পাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লোক দড়িতে ঝুলে মরবে, সেই দৃশ্য দেখতে পাব — এটা সে সময় আমাদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। বড়রা অবশ্যি ব্যাপারটাকে মোটেও পাত্তা দিল না। আমার নানাজান বললেন, আজ গরমটা অতিরিক্ত পড়েছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তিনি নারিকেল-মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, নাম্ হারামজাদা। নারিকেল-মামা বিনীত গলায় বললেন, 'জ্বে না মামুজী। ফাঁস নিমু।'

'তোরে মাইরা আজ হাড্ডি গুঁড়া করব। খেলা পাইছস? দুইদিন পরে পরে ফাঁস নেওয়া। ফাঁস অত সস্তা। রোজা রাখছস?'

'রাখছি।'

'রোজা রাইখ্যা যে ফাঁস নেওন যায় না এইটা জানস?'

'জ্বে না।'

'নাইম্যা আয়। ফাঁস নিতে চাস ইফতারের পরে নিবি। অসুবিধা কি? দড়িও তোর কাছে আছে। জাম গাছও আছে। নাম কইলাম। রোজা রাইখ্যা ফাঁস নিতে যায়! কত বড় সাহস! নাম।'

নারিকেল-মামা সুড়সুড় করে নেমে এলেন। মোটেও দেরি করলেন না। আমাদের মন কি যে খারাপ হল। মজার একটা দৃশ্য নানাজানের কারণে দেখা হল না। নানাজানের ওপর রাগে গা জ্বলতে লাগল। মনে ক্ষীণ আশা, ইফতারের পর যদি নারিকেল-মামা আবার ফাঁস নিতে যান।

ইফতারের পরও কিছু হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর নারিকেল-মামা হৃষ্টচিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোত্থেকে যেন একটা ল্যাটিম জোগাড় করলেন। শহর থেকে আসা বাচ্চাদের খুশি করার জন্যে উঠোনে লাটিম খেলার ব্যবস্থা হল। আমি এক ফাঁকে বলেই ফেললাম, মামা, ফাঁস নিবেন না? তিনি উদাস গলায় বললেন, যাউক, রমজান মাসটা যাউক। এই মাসে ফাঁস নেয়া ঠিক না।

'রমজানের পরে তো আমরা থাকব না। চলে যাব। আমরা দেখতে পারব না।'

নারিকেল-মামা উদাস গলায় বললেন, এইসব দেখা ভাল না গো ভাইগ্না ব্যাটা। জিহ্বা বাইর হইয়া যায়। চউখ বাইর হইয়া যায়। বড়ই ভয়ংকর।

'আপনি দেখেছেন?'

'ভাইগ্না ব্যাটা কি কয়? আমি দেখব না। একটা ফাঁসের মরা নিজের হাতে দড়ি কাইট্যা নামাইছি। নামাইয়া শইল্যে হাত দিয়ে দেখি তখনও শইল গরম। তখনও জান ভেতরে রইছে। পুরাপুরি কবজ হয় নাই।'

'হয়নি কেন?'

'মেয়েছেলে ছিল। ঠিকমত ফাঁস নিতে পারে নাই। শাড়ি পেঁচাইয়া কি ফাঁস হয়? নিয়ম আছে না? সবকিছুর নিয়ম আছে। লম্বা একটা দড়ি নিবা। যত লম্বা হয় তত ভাল। দড়ির এক মাথা বানবা গাছের ডালে, আরেক মাথা নিজের গলায়। ফাঁস গিটু বইল্যা একটা গিটু আছে। এইটা দিবা। তারপরে আল্লাহর কাছে তওবা কইরা সব গোনার জন্যে মাফ নিবা। তারপর চউখ বন্ধ কইরা দিবা লাফ।'

'দড়ি যদি বেশি লম্বা হয় তাহলে তো লাফ দিলে মাটিতে এসে পড়বেন।'

'মাপমত দড়ি নিবা। তোমার পা যদি মাটি থাইক্যা এক ইঞ্চি উপরেও থাকে তাইলে হবে। দড়ি লম্বা হইলে নানান দিক দিয়া লাভ। দশের উপকার।'

দড়ি লম্বা হলে দশের উপকার কেন তাও নারিকেল-মামা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

'ফাঁসের দড়ি নানা কাজে লাগে বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা? এই দড়ি সোনার দড়ির চেয়েও দামী। এক টুকরা কাইট্যা যদি কোমরে বাইন্ধ্যা থয় তা হইলে বাত-ব্যাধির আরাম হয়। ঘরের দরজার সামনে এক টুকরা বাইন্ধ্যা থুইলে ঘরে চোর-ডাকাত ঢোকে না। এই দড়ি সন্তান প্রসবের সময় খুব কাজে লাগে। ধর, সন্তান প্রসব হইতেছে না — দড়ি আইন্যা পেটে ছুঁয়াইবা, সাথে সাথে সন্তান খালাস।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। ফাঁসির দড়ি মহামূল্যবান। অনেক ছোট ছোট পুলাপান আছে বিছানায় পেসাব কইরা দেয়। ফাঁসের দড়ি এক টুকরা ঘুনসির সাথে বাইন্ধ্যা দিলে আর বিছানায় পেসাব করব না। এই জন্যেই বলতেছি যত লম্বা হয় ফাঁসের দড়ি ততই ভাল। দশজনের উপকার। ফাঁস নিলে পাপ হয়। আবার ফাঁসের দড়ি দশজনের কাজে লাগে বইল্যা পাপ কাটা যায়। দড়ি যত লম্বা হইব পাপ তত বেশি কাটা যাইব। এইটাই হইল ঘটনা। মৃত্যুর পরে পরেই বেহেশতে দাখিল।

নারিকেল-মামার মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে। ফাঁস নিয়ে না — বিছানায় শুয়ে। শেষ জীবনে পক্ষাঘাত হয়েছিল, নড়তে-চড়তে পারতেন না। চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে হত। মৃত্যুর আগে গভীর বিষাদের সঙ্গে বলেছিলেন — আল্লাহপাক আমার কোন আশা পূরণ করে নাই। ঘর দেয় নাই, সংসার দেয় নাই। কিছুই দেয় নাই। ফাঁস নিয়া মরণের ইচ্ছা ছিল এটাও হইল না। বড়ই আফসোস।

পরীক্ষা

একটা নির্দিষ্ট বয়সের বাবা-মা'রা মনে করতে শুরু করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা বোধহয় তাঁদের আর ভালবাসে না, বোধহয় তারা এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজেদের সংসার নিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তবে এই ব্যাপারে তাঁরা পুরোপুরি নিশ্চিতও হতে পারেন না। এক ধরনের সন্দেহ থাকে — হয়ত এখনো ভালবাসে। হয়ত বাবা মা'র প্রতি ভালবাসা নিঃশেষ হয়নি। এই সংশয়-জড়ানো দোদুল্যমান সময়ে বাবা-মা'রা নানান ধরনের ছোটখাট পরীক্ষা করতে থাকেন। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা এখনো আছে কি-না তা নিয়ে পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও তাঁরা সংশয়ে ভুগেন। কোন ফলাফলই তাঁদের ১০০ ভাগ নিশ্চিত করতে পারে না।

আমার মা বর্তমানে এ জাতীয় মানসিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর ছ'টি ছেলেমেয়েকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। তাদের আচার-আচরণ থেকে ধরার চেষ্টা করছেন — ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর প্রতি ভালবাসা কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

ভালবাসা মাপার মত কোন যন্ত্র আমাদের হাতে আসেনি। সমস্যাটা এইখানেই। ভালবাসা ধরতে হয় আচার-আচরণে — হাব-ভাবে। একজনের আচার-আচরণের সঙ্গে অন্যের আচার-আচরণের কিছুমাত্র মিল নেই বলে ভালবাসা'র প্রমাণ সংগ্রহ করাও এক সমস্যা। কাজেই আমার মা নানান ধরনের পরীক্ষা শুরু করলেন।

যেমন অনেকদিন পার করে আমার বাসায় এলেন। রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, শরীর ভাল না। উদ্দেশ্য — দেখা, তার ছেলে এই খবরে কতটা বিচলিত হয়। সে কি সাধাসাধি করে খেতে বসায়, না নির্বিকার থাকে। না-কি অতি ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডেকে আনে।

এই জাতীয় পরীক্ষায় আমি কখনো পাস করতে পারি না। আমার অন্য ভাই-বোনরাও পারে না। সবাই ভাব করে, বয়স হয়েছে, এখন শরীর তো খারাপ করবেই। শুধু আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই মায়ের অতিরিক্ত ভক্ত বলে ব্যস্ত হয়ে উঠে। জোর করে তাকে টেবিলে এনে খাওয়ায় — খাওয়াতে না পারলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার

আনতে যায়। তার একজন পরিচিত প্র্যাকটিসহীন ডাক্তার আছেন। যাঁকে যে কোন সময় কল দিলে চলে আসেন। আমাদের মধ্যে মা'র ভালবাসা পরীক্ষায় সেই শুধু অনার্সসহ পাস। আমরা ফেল।

আমার বন্ধু মোজাম্মেল হোসেন সাহেবের মাও এই আমার মা'র মতই ছেলেমেয়েদের ভালবাসা আছে কি নেই পরীক্ষা শুরু করেছেন। তিনি শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ। তবু একদিন দেখা যায়, কোন এক ছেলে বা মেয়ের কাছে গিয়ে অকারণে অনেকক্ষণ কাশলেন, হাঁচলেন। নিজেই নিজের কপালের উত্তাপ দেখলেন। তাঁর উদ্দেশ্য — ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর আচার-আচরণ দেখে জিজ্ঞেস করে কি-না — মা তোমার কি শরীর খারাপ? কি আশ্চর্য। তোমার শরীর খারাপ আমাদের বলবে না? দেখি কাপড় পর, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

তিনি বিরস গলায় বললেন, বাদ দে, ডাক্তারের কাছে কি নিবি। বয়স হয়েছে, গলায় রোগ-ব্যাধি তো হবেই।

'কথা বলে সময় নষ্ট করো না তো মা। কাপড় পর। ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।'

তিনি আনন্দিত চিত্তে কাপড় পরতে চলে যান। ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালবাসে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

আমার বন্ধু এবং বন্ধুর বোনরা তাঁদের মা'র এই ব্যাপারটা জানেন। তারা এখন নিয়ম করে সবাই তাঁদের মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। একেক জনের একেক ডাক্তার। মা মহাখুশি। তাঁর সময় কাটে ডাক্তারের কাছে ঘুরে ঘুরে।

আমার মা'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি — তিনি আমাদের নিয়ে অনেক ছোটখাট পরীক্ষা করলেন। বেশির ভাগ পরীক্ষার ফল হল — অনিশ্চিত। নিশ্চিত পরীক্ষা দরকার। কাজেই তিনি সেই পরীক্ষার জন্যে তৈরি হলেন। এক সন্ধ্যায় শুনলাম, তিনি বেশ কিছুদিন দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, এটা শুনেই তাঁর ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠবে — আরে না, অসম্ভব। আপনি দেশে যাবেন কি? না না, দেশে যেতে হবে না।

কিন্তু তা বলা হল না। মা দেশে চলে গেলেন। আর ফেরার নাম নেই। সাত দিনের বেশি যে মহিলা তাঁর ছেলেমেয়েদের না দেখে থাকতে পারেন না তিনি এক মাস কাটিয়ে দিলেন। ভাবলেন, ছেলেমেয়েরা খোঁজখবর করবে। আসতে না পারলেও চিঠি দেবে। না, কেউ চিঠিও দিল না। তিনি নিজেই লজ্জার মাথা খেয়ে সবার কাছে চিঠি লিখলেন — অতি সংক্ষিপ্ত পত্র।

> "আমি ভাল আছি। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। নামাজ পড়বে। সর্বদা আল্লাহপাককে স্মরণ করবে। ইতি তোমার মা।"

আমরা কেউ সেই চিঠির জবাব দিলাম না। আসলে মা'র অভিমানের গুরুত্বই কেউ ধরতে পারলাম না। এই বয়সে তিনি যে ছেলেমেয়েদের এক জটিল পরীক্ষায় ফেলবেন সেটা কে অনুমান করবে? আমরা ভাবলাম, নিজের বাড়িতে থাকতে মা'র নিশ্চয় খুব ভাল লাগছে। ভাল না লাগলে তো চলেই আসবেন।

দু' মাস কেটে গেল। আমার ছোট মেয়ে একদিন বলল, আজ রাতে দাদীকে স্বপ্নে দেখেছি। দাদীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তখন আমার মনে হল, আরে তাই তো — অনেক দিন মা'কে দেখি না। বাসাটা খালি। আচ্ছা চল, মা'কে ধরে নিয়ে আসি। মাইক্রোবাস নিয়ে চলে যাই ময়মনসিংহে। সবাইকে খবর দেয়া যাক। ক্ষীণ একটা আপত্তি উঠল — এই গভীর রাতে বাস নিয়ে এতদূর যাওয়াটা কি ঠিক হবে? সেই আপত্তি বাচ্চাদের উৎসাহের কাছে টিকল না। এক্ষুনি যেতে হবে। এক্ষুনি। রাত এগারোটায় বাস ভর্তি করে আমরা সব ভাই-বোন, তাদের বাচ্চা-কাচ্চারা রওনা হলাম।

ময়মনসিংহে পৌঁছলাম রাত দু'টায়। মা তাঁর এক ভাইয়ের বাসায় আছেন। সেই বাসার ঠিকানা জানা নেই। ঠিকানা খুঁজে বাসা বের করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেল। রাত তিনটায় কড়া নেড়ে মা'র ঘুম ভাঙানো হল।

বাচ্চা-কাচ্চারা চেঁচিয়ে বলল, দাদীমা, তোমাকে নিতে এসেছি।

মা'র চোখ ভিজে উঠল। তিনি কপট বিরক্তিতে বললেন, এদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি। কোথাও গিয়ে যে শান্তিমত দু'-একটা দিন থাকব সেই উপায় নেই। রাত তিনটার সময় উপস্থিত হয়েছে। ছেলেমেয়েগুলিরও কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই — রাত তিনটায় দুধের বাচ্চা নিয়ে সব রওনা হয়েছে। রাস্তায় যদি বিপদ-আপদ কিছু ঘটতো? এদের বুদ্ধি-শুদ্ধি কি কোন কালেই হবে না?

মা তার বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমেয়েদের বকা ঝকা করতে করতে নিজের ব্যাগ গুছাতে শুরু করেছেন। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা টের পাবার যে কঠিন পরীক্ষা মা শুরু করেছিলেন আমরা সবাই সেই পরীক্ষায় ফেল করতে করতে ভাগ্যক্রমে লেটার মার্ক পেয়ে পাস করে গেলাম।

ঢাকায় ফেরার পথে মনে হল, এই দিন খুব দূরে নয় যখন ভালবাসার পরীক্ষা নেবার কেউ থাকবে না। পরীক্ষায় পাস-ফেল নিয়ে আমাদের চিন্তিত হতে হবে না। আমরা সবাই নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার অফুরন্ত সুযোগ পাব।

বাসের পেছনের সীটে দাদীর পাশে কে বসবে তা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। মা'র গলা শুনতে পাচ্ছি — তোরা কি যে যন্ত্রণা করিস! এই জন্যেই মাঝে-মধ্যে তোদের ছেড়ে চলে যাই।

আমার বন্ধু সফিক

ইদানীং পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে বড় ধরনের ধাক্কা খাই — কি চেহারা একেকজনের — দাঁত পড়ে গেছে, গালের চামড়া গেছে কুঁচকে, মাথায় অল্প কিছু ফিনফিনে চুল। কলপ দিয়ে সেই চুলের বয়স কমানো হয়েছে কিন্তু সাদা সাদা গোড়া উঁকি দিচ্ছে।

ওদের দিকে তাকালে মনে হয় — হায় হায়, আমার এত বয়স হয়ে গেছে? এখন কি তাহলে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করব? মীরপুর গোরস্তানে জমি দেখতে যাব?

আয়নায় যখন নিজেকে দেখি তখন এতটা বয়স মনে হয় না। হাস্যকর হলেও সত্যি, নিজেকে যুবক-যুবকই লাগে। ঐ তো কি সুন্দর চোখ! চোখের নিচে কালি পড়েছে। এটা এমন কিছু না, রাত জাগি, কালি তো পড়বেই। কয়েক রাত ঠিকমত ঘুমুতে পারলে চোখের কালি দূর হয়ে যাবে। মুখের চামড়ার বলিরেখা? ও কিছু না। অনেক যুবক ছেলেদের মুখেও এমন দাগ দেখা যায়। মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে? এটা কোন ব্যাপারই না। চুল পাকা বয়সের লক্ষণ নয়। মানুষের বয়স শরীরে না, মনে।

আমাদের মত বয়েসীদের হঠাৎ রঙিন কাপড়ের দিকে ঝুঁকে যেতে দেখা যায়। চক্রাবক্রা হাওয়াই শার্ট পরে এরা তেজী তরুণের মত হাঁটতে চেষ্টা করে — জরাকে অগ্রাহ্য করার হাস্যকর চেষ্টা। চোখে-মুখে এমন একটা ভাব যেন এইমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পড়া চুকিয়ে রাস্তায় নেমেছি। বান্ধবীকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোন কাফেতে চা খেতে যাব কিংবা বাদাম ভাঙতে ভাঙতে রাস্তায় হাঁটব।

এরকম একদিনের কথা। নাপিতের দোকান থেকে চুল কেটে বের হয়েছি। চুল কাটার ফলে গোড়ার শাদা চুল বের হয়ে এসেছে। বিশ্রী দেখাচ্ছে। মেজাজ খারাপ করে এক পান সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি। সিগারেট কিনে বাসায়

ফিরব। হঠাৎ দেখি যুবক একটা ছেলে কদবেল কিনছে। সে বসেছে উবু হয়ে। বেল শুঁকে শুঁকে দেখছে। তার পেছনেই শাড়ি পরা এক তরুণী। তরুণী লজ্জা পাচ্ছে বলে মনে হল। ছেলেটিকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আবার চিনতেও পারছি না। সে দু'টা কদবেল কিনে উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, আরে তুই!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ হচ্ছে আমাদের সফিক। ঢাকা কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। তারপর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

সফিক বলল, তুই এত বিশ্রী করে চুল কেটেছিস। তোকে দেখাচ্ছে পকেটমারের মত।

আমার হতভম্ব ভাব তখনো কাটে নি। আমি অবাক হয়ে সফিককে দেখছি। ব্যাটার বয়স বাড়ে নি। জরা তাকে স্পর্শ করে নি। তাকে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না।

সফিক বলল, দোস্ত, এ হচ্ছে আমার বড় মেয়ে। ইন্টারমিডিয়েট সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। এর নাম শাপলা। শাপলা মা, চাচাকে পা ছুঁয়ে সালাম কর্।

আমি বললাম, বাজারের মধ্যে কিসের সালাম?

'বাজার-টাজার বুঝি না। সালাম করতে হবে।'

মেয়ে একগাদা লোকের মধ্যেই নিচু হয়ে সালাম করল। সফিক আমার হাত ধরে বলল, চল আমার সাথে।

'কোথায়?'

'আমার বাসায়, আবার কোথায়?'

'আরে না। চুল কেটেছি — গোসল করব।'

'কোন কথা না। শাপলা মা — তুই শক্ত করে চাচার একটা হাত ধর্। আমি আরেক হাত ধরছি। দু'জনে মিলে টেনে নিয়ে যাব।'

আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হল। ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে আর্থিক অবস্থা নড়বড়ে। বসার ঘরে বার ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি। ইদানীং টিভির মাপ থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা আঁচ করার একটা সুবিধা হয়েছে। সফিক আমাকে টানতে টানতে একেবারে রান্নাঘরে নিয়ে উপস্থিত — দাঁড়া বৌকে অবাক করে দিই — সে তোর নাটক দেখে গ্যালন গ্যালন চোখের পানি ফেলে। চোখের পানির মূল মালিক ধরে নিয়ে এসেছি।

রান্নাঘরে আমাকে দেখে সফিকের স্ত্রী অত্যন্ত বিব্রত হল এবং দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। স্বামীর পাগলামির সঙ্গে বেচারী বোধহয় এত দিনেও মানিয়ে নিতে পারে নি।

'ছিঃ ছিঃ, কি অবস্থা রান্নাঘরের। এর মধ্যে আপনাকে নিয়ে এসেছে। ওর কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না। ও কি ছাত্র-জীবনেও এরকম ছিল?'

আমি জবাব দিতে পারলাম না। ছাত্র-জীবনে সফিক কেমন ছিল আমার মনে নেই। ডিম-সিদ্ধ তার খুব পছন্দের খাবার ছিল — এইটুকু মনে আছে। সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে আস্ত মুখে ঢুকিয়ে দিত। এই সময় তার আরামে চোখ বন্ধ হয়ে যেত।

আমি লক্ষ্য করলাম, সফিকের বয়স না বাড়লেও তার স্ত্রীর ঠিকই বেড়েছে। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয়, জীবন-যুদ্ধে তিনি পরাজিত। ক্লান্তি ও হতাশা তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। অসুখ-বিসুখেও মনে হয় ভুগছেন। যতক্ষণ কথা বললেন, ক্রমাগত কাশতে থাকলেন —। কাশতে কাশতে বললেন, আপনি এসেছেন আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে যে যত্ন-টত্ন করব সেই সামর্থ নেই। সংসারের অবস্থা ভাঙ্গা নৌকার মত। কোনমতে টেনে নিচ্ছি। ইভিনিং শিফটে একটা স্কুলে কাজ করি। ঐ বেতনটাই ভরসা। কাজটা না থাকলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করতে হত।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সফিক কিছু করে না?

'করে। ও একটা ব্যাংকের ম্যানেজার। তাতে লাভ কিছু নেই। আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন তো -- পুরো বেতন কখনো সে আমার হাতে দিয়েছে কি-না। এমনও মাস যায় একটা পয়সা আমাকে দেয় না। আপনিই বলুন, আমি কি বাচ্চাগুলোকে পানি খাইয়ে মানুষ করব?'

সফিক বলল, চুপ কর। প্রথম দিনেই কী অভিযোগ শুরু করলে! এইসব বলার সুযোগ আরো পাবে। আজ না বললেও চলবে। ফাইন করে চা বানাও। হুমায়ুন খুব চা খায়। সে আগের জন্মে চা বাগানের কুলী ছিল।

সফিকের স্ত্রী কঠিন গলায় বলল, ভাই, চা আপনাকে খাওয়াচ্ছি — কিন্তু আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে। এবং যাবার আগে আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলে যেতে হবে — তার নিজের সংসারটাই আসল —। আগে সংসার দেখতে হবে . . .

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

বেড়াতে এসে এ কী পারিবারিক সমস্যার মধ্যে পড়লাম! সফিক প্রায় জোর করে তার স্ত্রীকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল। আমি বললাম, তোর সমস্যাটা কি?

'আরেক দিন বলব।'

'আজই শুনে যাই।'

সফিক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সমস্যা বলা শুরু করল। সফিকের জবানীতেই তার সমস্যা শুনি।

'বুঝলি দোস্ত, তখন সবে চাকরি পেয়েছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি। নিউ পল্টন লাইনে এক কামরার একটা বাসা নিয়ে থাকি। দেশে টাকা পাঠাতে হয় না। বেতন যা

পাই নিজেই খরচ করি। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হৈ-চৈ। এখানে ওখানে বেড়ানো খানিকটা বদ অভ্যাসও হয়ে গেল — মাঝে-মধ্যে মদ্যপান করা। বন্ধু-বান্ধব এসে ধরে — একটা হুইস্কির বোতল কিনে আন। বেতন পেয়েছিস, সেলিব্রেট কর্। কিনে ফেলি। অভ্যাসটা স্থায়ী হল না, কারণ আমার বডি সিস্টেম এলকোহল সহ্য করে না। সামান্য খেলেও সারা রাত জেগে থাকতে হয় — এবং অবধারিতভাবে শেষ রাতে হড় হড় করে বমি হয়।

এক রাতের কথা — সামান্য মদ্যপান করে বাসায় ফিরছি। সামান্যতেই নেশা হয়ে গেছে। একটা রিকশা নিয়েছি। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে রিকশা থেকে পড়ে যাব। অনেক কষ্টে হুড ধরে বসে আছি, এমন সময় এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা চাইতে এল। তার ছেলের চিকিৎসার জন্যে খরচ। আমি ছেলেটিকে দেখে চমকে উঠলাম। সাত-আট বছর বয়স। ফুটফুটে চেহারা। সম্পূর্ণ নগ্ন। নগ্ন থাকার কারণ হল — তার অসুখের ডিসপ্লে নগ্ন না হলে সম্ভব নয়। ছেলেটির অণ্ডকোষ ফুটবলের মত প্রকাণ্ড। তাকালেই ঘেন্না হয়। আমি দ্রুত একটা একশ' টাকার নোট বের করে দিলাম। ছেলের বাবা আনন্দের হাসি হাসল। এই হাসি দেখেই মনে হল — এই লোক তো ছেলের চিকিৎসা করাবে না। ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা করাই তার পেশা। ছেলে সুস্থ হলে বরং তার সমস্যা।

আমি বললাম, রোজ ভিক্ষা করে কত পাওয়া যায়?

সে গা-ছাড়া ভাব করে বলল, ঠিক নাই। কোনদিন বেশি, কোনদিন কম।

'আজ কত পেয়েছ? আমারটা বাদ দিয়ে কত?'

'আছে কিছু।'

'কিছু-টিছু না। কত পেয়েছ বল।'

লোকটি বলতে চায় না। কেটে পড়তে চায়। আমি তখন নেশাগ্রস্ত। মাথার ঠিক নেই। আমি হুংকার দিলাম, যাচ্ছ কোথায়? এক পা গেছ কি খুন করে ফেলব। বল আজ কত পেয়েছ —?

'ধরেন দুই শ'।'

'তুমি কি এই ছেলেকে চিকিৎসার জন্যে কোন দিন হাসপাতালে নিয়ে গেছ? বল ঠিক করে, মিথ্যা কথা বললে খুন করে ফেলব।'

সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। আমি বললাম, এখনি চল আমার সাথে হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজে আমার এক বন্ধু আছে, ডাক্তার — তাকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। বাচ্চা কোলে নিয়ে রিকশায় উঠে আস।

সে কিছুতেই আমার সঙ্গে যাবে না। আমি নিয়ে যাবই। মাতালদের মাথায় একটা কিছু ঢুকে পড়লে সহজে বের হতে চায় না। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ — চিকিৎসা

করাবই। এর মধ্যে আমার চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই আমাকে সমর্থন করছে। লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেছে। সে মিন মিন করে বলল, ডাক্তার অপারেশন করব। অপারেশন করলে আমার পুলা মারা যাইব।

আমি আবারো হুংকার দিলাম — ব্যাটা ফাজিল। ছেলের অসুখের চিকিৎসা করাবে না। অসুখ দিয়ে ফয়দা লুইবে — চল্ হাসপাতালে।

অসাধ্য সাধন করলাম। দুপর রাতে এদের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বন্ধুকে খুঁজে বের করলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলল, এই দুপুর-রাতে রোগি ভর্তি করব কি ভাবে? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এই যন্ত্রণা কোত্থেকে জুটিয়েছিস?

আমি বললাম, কিছু শুনতে চাই না। তুই এর ব্যবস্থা করবি। খরচ যা লাগে আমি দিব।

ব্যবস্থা একটা হল। দেখা গেল, অসুখ তেমন জটিল নয়। খাদ্যনালীর অংশবিশেষ মূত্রথলিতে নেমে গেছে। ডাক্তার খাদ্যনালীটা উপরে তুলে দেবে। মূত্রনালী ফুটো ছোট করে দেবে। অসুখটা হল খারাপ ধরনের হার্নিয়া।

অপারেশনের তারিখ ঠিক হল। আমি মহাখুশি। শুধু ছেলের বাবা কেঁদে-কেটে অস্থির। তার ধারণা, ছেলে মারা যাচ্ছে। তার একটাই ছেলে। স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেকে নিয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। একটাই তার একমাত্র শখ। মনে মনে বললাম, হারামজাদা! ছেলের অসুখ হওয়ায় মজা পেয়ে গেছিস? দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো বার করছি। শুওর কা বাচ্চা। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। ছেলেকে শুধু যে ভাল করব তাই না স্কুলেও ভর্তি করাব। মজা বুঝবি।

অপারেশন হয়ে গেল। সাকসেসফুল অপারেশন। ছেলেটিকে অপারেশন টেবিল থেকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়া হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটা মারা গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হায়, হায়! এ কি সর্বনাশ! আমার কারণে ছেলেটা মারা গেল? ছেলের বাবার সঙ্গে দেখা করার সাহসও হল না। আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে এলাম।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম — আর পরোপকার করতে যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। সারা রাত এক ফোটা ঘুম হল না। কেন ছেলেটা মরে গেল? কেন?

বুঝলি দোস্ত, ছেলেটা মারা যাবার পর আমার আসল সমস্যা শুরু হল। আমার রোখ চেপে গেল। ঠিক করলাম — যখন যেখানে অসুস্থ ছেলেপেলে দেখব, চিকিৎসা করাব। দেখি কি হয়। দেখি এরা বাঁচে না মরে। সেই থেকে শুরু।

রাস্তায় অসুখ-বিসুখে কাতর কাউকে দেখলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। টাকা-পয়সা সব এতেই চলে যায়।

তারপর বিয়ে করলাম। সংসার হল। অভ্যাসটা গেল না। চিকিৎসার খরচ আছে। আমি বেতনও তো তেমন কিছু পাই না। সংসারে টানাটানি লেগেই থাকে। বিয়ের সময় তোর ভাবী বেশ কিছু গয়না-টয়না পেয়েছিল। সব বেচে খেয়ে ফেলেছি। এই নিয়েও সংসারে অশান্তি। হা হা হা।

'কতজন রোগি এই ভাবে সুস্থ করেছিস?'

'অনেক।'

'আর কেউ মারা যায় নি?'

'না। আর একজনও না। প্রথমজনই শুধু মারা গেল। আর কেউ না।'

'এই মুহূর্তে কারোর চিকিৎসা করছিস?'

'হ্যাঁ এখনো একজন আছে। জয়দেবপুরের এক মেয়ে। ঠোঁট কাটা। প্লাস্টিক সার্জারী করে ঠোঁট ঠিক করা হবে।'

আমি মুগ্ধ গলায় বললাম, তুই যে কত বড় কাজ করছিস সেটা কি তুই জানিস?

সফিক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বড় কাজ করছি, না ছোট কাজ করছি তা জানি না, তবে আমার একেকটা রোগি যেদিন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে, সেদিন যে আমার কত আনন্দ হয় তা শুধু আমিই জানি। এই আনন্দের কোন তুলনা নেই। প্রতিবারই আমি আনন্দ সামলাতে না পেরে হাউমাউ করে কাঁদি। লোকজন, ডাক্তার, নার্স সবার সামনেই কাঁদি।

বলতে বলতে সফিকের চোখে পানি এসে গেল। পানি মুছে সে স্বাভাবিক গলায় বলল, তারপর দোস্ত, তোর খবর বল। তুই কেমন আছিস?

আমি মনে মনে বললাম, শারীরিকভাবে আমি ভাল আছি। কিন্তু আমার মনটা অসুস্থ হয়ে আছে — তুই আমার মন সুস্থ করে দে। এই ক্ষমতা অল্প কিছু সৌভাগ্যবানদের থাকে। তুই তাদের একজন।

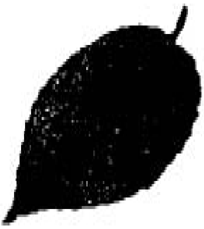

মিসির আলি ও অন্যান্য

কিশোর বয়সে সুবোধ ঘোষের একটি উপন্যাস পড়েছিলাম — 'শুন বরনারী'। উপন্যাসের মূল চরিত্র একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, হিমাদ্রী। অনেকদিন সেই ডাক্তারের ছবি আমার চোখে ভাসতো। মাঝে মাঝে রাস্তায় কাউকে দেখে চমকে উঠে ভাবতাম, আরে, ইনি তো অবিকল হিমাদ্রীর মত। কিশোর বয়সে মাথায় অনেক পাগলামি ভর করে। সেই পাগলামির কারণেই হয়ত এক সন্ধ্যাবেলায় হিমাদ্রী বাবুর কাছে এক পাতার একটা চিঠি লিখে ফেললাম। চিঠিতে অনেক সমবেদনার কথা বলা হল। চিঠি পাঠানো যায় কি করে? হিমাদ্রী বাবুর ঠিকানা আমি জানি না, সুবোধ ঘোষের ঠিকানাও জানা নেই। চিঠিটা অনেক দিন অঙ্ক খাতায় বন্দী পড়ে রইল। এক সময় হারিয়েও গেল। একজন মুগ্ধ কিশোরের আবেগ ও ভালবাসা হিমাদ্রী কিংবা সুবোধ ঘোষ জানতে পারলেন না।

চিঠিটি কিন্তু হারায়নি। প্রকৃতি কোন কিছুই হারাতে দেয় না। যত্ন করে তুলে রাখে। কোন এক বিশেষ সময়ে বিশেষ মুহূর্তে সেই হারানো জিনিস বের করে এনে সবাইকে হকচকিত্ত করে দেয়। আমার বেলায় এই ব্যাপারটা ঘটল। লক্ষ্মীপুর থেকে সপ্তম শ্রেণীর জনৈক বালক মিসির আলিকে একটা একপাতার চিঠি লিখল। মিসির আলির প্রতি সমবেদনায় সেই চিঠি পূর্ণ। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই চিঠির ভাষা এবং আমার চিঠির ভাষা একই রকম। যেন প্রকৃতি পঁয়ত্রিশ বছর পর আমার চিঠিই আমাকে ফেরত পাঠাল।

আমার উপন্যাসে বারবার ফিরে আসা চরিত্রগুলিকে নিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে বলা হয়েছে। লিখতে গিয়ে তাই মিসির আলির কথাই প্রথম মনে পড়ল। তাঁকে দিয়েই শুরু করি।

মিসির আলি

মিসির আলি মানুষটা দেখতে কেমন? আমি ঠিক জানি না। জানলে বই-এ তাঁর চেহারার বর্ণনা থাকতো। তেমন কোন বর্ণনা নেই। চশমা পরেন এটা বলা হয়েছে। চশমা তো আর চেহারার বর্ণনা হবে না। চশমা অনেকেই পরেন।

বলা হয়েছে, তীক্ষ্ণ চোখে তিনি তাকান। সেই তীক্ষ্ণ চোখও তো কারোর বোঝার উপায় নেই কারণ চোখ ঢাকা থাকে চশমার মোটা কাচের আড়ালে। মানুষটার কি মাথাভর্তি চুল? না-কি টাক-মাথা? চুলের কথা কোন উপন্যাসে বলিনি, তবে চুল আছে। চুল যে আছে তা বুঝলাম মিসির আলিকে নিয়ে প্রচারিত দুটা টিভি নাটকে। নাটক দুটিতে মিসির আলির চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা আবুল হায়াত। টেকো মিসির আলিকে দেখে চমকে উঠলাম। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, না না, মিসির আলির মাথায় টাক নেই। তাঁর মাথাভর্তি ঘন চুল। এখন বললে তো হবে না, বই-এ কিছু বলিনি।

মিসির আলিকে নিয়ে যখন কিছু লিখি তখন কি কোন চেহারা আমার মনে ভাসে? সচেতনভাবে কিছু ভাসে না। অবচেতন মনে নিশ্চয়ই ছবি আঁকা থাকে। সেই ছবি সাধারণ মানুষের ছবি। অন্তর্মুখী একজন মানুষ, যিনি বই পড়তে ভালবাসেন। অন্তর্মুখী মানুষরা অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন না, কিন্তু মিসির আলি পছন্দ করেন। প্রায়ই দেখা যায় — আগ্রহ নিয়ে তিনি অনেককে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেন। অন্তর্মুখী মানুষ এই কাজটি কখনো করবে না। এই মানুষটির প্রধান গুণ কি? আমার মতে, কৌতূহল এবং বিস্ময়বোধ করার অসাধারণ ক্ষমতা। কৌতূহল আমাদের সবারই আছে, কিন্তু কৌতূহল মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় পরিশ্রমটি আমরা করি না। করতে চাই না। অন্তর্মুখী মানুষ হয়েও মিসির আলি কিন্তু এই পরিশ্রমটা করেন। উদাহরণ দেয়া যাক। উদাহরণ থেকে মিসির আলির কৌতূহলের ধরন পরিষ্কার হবে। আমরা প্রায়ই ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা জাতীয় সাইনবোর্ড দেখি। খুব কি কৌতূহলী হই? মিসির আলি কিন্তু হন। যেমন,

"মুগদাপাড়া থেকে যে রাস্তাটা মান্ডার দিকে গিয়েছে তার প্রথম ডানদিকের বাঁকে বেশ কয়টা দোকান। একটা স্টেশনারী শপ, দুটা সাইকেল টায়ারের দোকান, একটা সেলুন এবং একটি হেকিমী ঔষধের দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা — ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা। হেকিম আবদুর রব।

মিসির আলি ইদানিং এই পথে যাওয়া-আসা করেন, কারণ তিনি বাসা নিয়েছেন মান্ডায়। ঢাকায় আসতে হলে তাঁকে অতীশ দীপংকর রোড ধরতে হয়। এই পথে

আসা ছাড়া উপায় নেই। দোকানগুলির সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানার দিকে তাকান।

মানুষের কৌতূহল জাগ্রত করার মত তেমন কিছু দোকানে নেই। ভেতরটা অন্ধকার। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে পুরানো ভারী আলমিরা। আলমিরার পাল্লা কাঠের বলে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। দু'পাশে বইয়ের র‍্যাকের মত বেশ কিছু র‍্যাক। র‍্যাক ভর্তি কাচের এবং চিনামাটির বৈয়ম। সব দোকানেই টেবিল বা টেবিল জাতীয় কিছু থাকে। এখানে নেই। দুটা বেতের চেয়ার পাশাপাশি বসানো। একটিতে সারাক্ষণ ভয়ংকর রোগা, লম্বা এবং অস্বাভাবিক ফর্সা একজন মানুষ বসে থাকেন। সম্ভবত তিনিই হেকিম আবদুর রব। তাঁর হাতে একটা পত্রিকা থাকে, তবে সব সময় পত্রিকা পড়েন না। বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায়, হাতে পত্রিকা আছে ঠিকই, কিন্তু ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে।

মিসির আলি এখন পর্যন্ত এই দোকানে দ্বিতীয় কোন মানুষ দেখেননি। সঙ্গত কারণেই হেকিমী, আয়ুর্বেদী জাতীয় চিকিৎসার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে আসছে। এই দোকানের সামনে এলেই মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করে, এই লোকটির সংসার কি করে চলে? অনেক ব্যাপার আছে জানতে ইচ্ছা করলেও জানা যায় না। মিসির আলির পক্ষে সম্ভব নয় দোকানে ঢুকে হেকিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনার কাছে তো কখনো কাউকে আসতে দেখি না। আপনার সংসার কি করে চলে?

মানুষটা দিনের পর দিন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে কি ভাবেন, তাও মিসির আলির জানতে ইচ্ছে করে। নিজে নিঃসঙ্গ বলেই বোধহয় আরেকজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এবং প্রায়ই ভাবেন কোন একদিন দোকানটির সামনে রিকশা থেকে নেমে পড়বেন। কৌতূহল মিটিয়ে নেবেন। সেই কোন-একদিন এখনো আসছে না। কেন আসছে না এই নিয়েও মিসির আলি ভেবেছেন। তাঁর ধারণা, মানুষের কৌতূহলের একটি থ্রেসহোল্ড লিমিট আছে। কৌতূহল সেই লিমিটের নিচে হলে মানুষ কখনো তা মেটাতে চেষ্টা করে না। যখন লিমিট অতিক্রম করে কেবল তখনি কৌতূহল মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড শুরু করে। রাস্তায় কোন ভিখিরী শিশুকে একা একা কাঁদতে দেখলে আমাদের কৌতূহল হয়। জানতে ইচ্ছে করে কেন সে কাঁদছে। কিন্তু সেই কৌতূহল থ্রেসহোল্ড লিমিটের নিচে বলে কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না — এই মেয়ে কাঁদছ কেন?

পৌষ মাসের এক বিকেলে মিসির আলির কৌতূহল থ্রেসহোল্ড লিমিট অতিক্রম করল। তিনি দাওয়াখানার সামনে রিকশা থেকে নামলেন। এম্নিতেই হেকিম

সাহেবের ঘর থাকে অন্ধকার। আজ আরো অন্ধকার লাগছে, কারণ সন্ধ্যা হয় হয় করছে, আকাশ মেঘলা। ঘরে এখনো বাতি জ্বালানো হয়নি।

খবরের কাগজ হাতে চেয়ারে বসে থাকা ভদ্রলোক চোখ তুলে মিসির আলির দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিস্পৃহ। সেখানে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কোন কিছুরই ছোঁয়া নেই। দূর থেকে ভদ্রলোকের বয়স বোঝা যাচ্ছিল না। এখন বোঝা যাচ্ছে। বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে, তবে হালকা পাতলা গড়ন বলে বোঝা যাচ্ছে না। এই বয়সে মানুষের মাথার চুল কমে যায়, তবে ভদ্রলোকের বেলায় তা হয়নি। তাঁর মাথা ভর্তি ধবধবে শাদা চুল।

মিসির আলি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমি একটা সামান্য জিনিস আপনার কাছে জানতে এসেছি। আমি আপনার কাছেই থাকি, ঝান্ডার নয়াবাজারে।

'বসুন।'

মিসির আলি বসলেন। ভদ্রলোক খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, কি জানতে চান বলুন?

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ পরিষ্কার। মানুষের গলার শব্দেও বয়সের ছাপ পড়ে। এই ভদ্রলোকের তা পড়েনি। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে খানিকটা বিরক্ত হচ্ছেন। মিসির আলির অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

'কি জানার জন্য এসেছেন বলুন?'

'আপনার দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা। ইউনানী তিব্বিয়া শব্দ দুটার মানে কি?'

'এটা জানার জন্যে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'কেন জানতে চান?'

'কৌতূহল, আর কিছু না।'

'আপনি কি করেন?'

'তেমন কিছু করি না। এক সময় অধ্যাপনা করতাম। এখন সাইকোলজির উপর একটা বই লেখার চেষ্টা করছি। আপনিই কি হেকিম আবদুর রব?'

'না। হেকিম আবদুর রব আমার দাদা। আমরা চার পুরুষের হেকিম। আমি হচ্ছি শেষ পুরুষ। আপনি শুধুমাত্র ইউনানী এবং তিব্বিয়া এই শব্দ দুটির অর্থের জন্যে আমার কাছে এসেছেন দেখে বিস্ময় বোধ করছি। অর্থ বলছি। আপনি কি চা খাবেন? সন্ধ্যাবেলা আমি এক কাপ চা খাই।'

'চা কি দোকান থেকে আনাবেন?'

'না, আমি নিজেই বানাব। ভাল কথা, আপনার নাম জানা হয়নি।'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'মিসির আলি সাহেব, আপনি কি ধূমপান করেন?'

'জ্বি করি।'

'আমার নাম আবদুল গনি। হেকিম আবদুল গনি। আপনি বসুন, আমি চা বানাচ্ছি।'

মিসির আলি বসে রইলেন। আবদুল গনি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দোকানের পেছনে, র‍্যাকগুলির ওপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। চায়ের সরঞ্জাম সেখানেই রাখা। মিসির আলি লক্ষ করলেন, বেশ দামী একটি ইলেকট্রিক কেতলিতে চায়ের পানি গরম হচ্ছে। চা দেওয়াও হল দামী কাপে। ভদ্রলোক সিগারেটের টিন বের করলেন। আবদুল্লাহ নামের মিশরীয় সিগারেট। ড্যাম্প যাতে না হয় তার জন্যে বাজারজাত করা হয় টিনের কৌটায়। বাংলাদেশে এই বস্তু সচরাচর চোখে পড়ে না।

আবদুল গনি সাহেব চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আমার বড় মেয়ে কায়রোতে থাকে। সে মাঝে-মধ্যে উপহার হিসেবে এটা-সেটা পাঠায়। চায়ে চিনি হয়েছে?

'জ্বি।'

'এখন আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ইউনানী শব্দটা এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ইউনান থেকে। ইউনান হল — গ্রীস দেশ। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ইউনান বা গ্রীস ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের লীলাভূমি। হিপোক্রেটিসের মত পণ্ডিত এবং গ্যালেনের মত চিকিৎসকের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম উন্নতি হয়। গ্রীস থেকে এই বিদ্যা মুসলিম চিকিৎসকদের হাতে আসে। যেহেতু ইউনান হচ্ছে এই শাস্ত্রের কেন্দ্রভূমি, কাজেই তাঁরা এর নাম দেন ইউনানী।'

'আর তিব্বিয়া? তিব্বিয়াটা কি?'

'তিব্বিয়া এসেছে 'তিব্ব' থেকে। আরবিতে 'তিব্ব' মানে চিকিৎসা সম্পর্কিত। আপনার কৌতূহল কি মিটেছে?'

'জ্বি।'

'আরো কিছু জানতে চাইলে আসবেন। এই বিষয়ে আমার কিছু পড়াশোনা আছে। আজ তাহলে উঠুন। সন্ধ্যার পর আমি দোকান বন্ধ করে দি। আমার চোখের অসুবিধা আছে। রাতে আমি ভাল দেখি না।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, রোগী আপনার কাছে কেমন আসে?

'আসে না। আসার কথাও না। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অনেক দূর এগিয়েছে। এদের হাতে আছে শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক, সালফা ড্রাগ। চিকিৎসা

পদ্ধতি সহজ হয়েছে, দ্রুত হয়েছে। হেকিমী বিদ্যা আগে যেখানে ছিল এখনো সেখানেই আছে।'

'আপনার কথা থেকে তো মনে হচ্ছে বর্তমান আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শুরুটা হচ্ছে ইউনানী।'

'হ্যাঁ তাই। বর্তমান কালের ডাক্তাররা হিপোক্রেটিস শপথ নেন। ইউনানী শাস্ত্রের উন্নতি হয় হিপোক্রেটিসের পৃষ্ঠপোষকতায়। মিসির আলি সাহেব, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আজ তাহলে আপনি আসুন। রাতে আমি একেবারেই চোখে দেখি না। রিকশা এসে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যায়।"

মিসির আলি ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

তাঁর কৌতূহল শুধু ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানায় নয় — তাঁর কৌতূহল পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেও। তিনি এই সব বিজ্ঞাপন গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েন। শুধু পড়েই ভুলে যান না। ভাবেন। আবারো উদাহরণ —

"পত্রিকায় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বের হয়েছে। সব পত্রিকায় নয়, একটি মাত্র পত্রিকায়। হারানো বিজ্ঞপ্তি, বাড়ি ভাড়া, ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে নতুন ধরনের একটি বিজ্ঞাপন। শিরোনাম — পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার শব্দটির আলাদা একটি মোহ আছে। বিজ্ঞাপনটা অনেকেই পড়ল। কেউ মাথা ঘামাল না। কারণ একটা অংকের ধাঁধা দেয়া। বলা হয়েছে, কেউ এটা পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কোন ঠিকানা নেই, বক্স নম্বর দেয়া। অল্প বয়েসী কিছু উৎসাহী ছেলেপুলে ধাঁধাটি নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করল। কেউ মনে হয় সমাধান করতে পারল না। কারণ পরের সপ্তাহে আবার বিজ্ঞাপনটি বেরুল। তার পরের সপ্তাহে আবার। পরপর চার সপ্তাহ ছাপা হবার পর বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু না, অন্য একটি পত্রিকায় আবার ছাপা হল। সেই পত্রিকায় পরপর চার সপ্তাহ ছাপা হবার পর অন্য একটি পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি এ রকম —

পুরস্কৃত করা হবে

নীচে একটি অংকের সমস্যা দেয়া হল।
এর সমাধান কেউ করতে পারলে তাঁকে
পুরস্কৃত করা হবে। সমাধান ও পূর্ণ
নাম-ঠিকানাসহ যোগাযোগ করুন।
জিপিও পোস্ট বক্স নং ৩১১

$$\begin{vmatrix} ২১১ & ৭৩০ \\ ১০১ & ১২ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ১১ \\ ৩ \end{vmatrix} = ১১ ৫$$

$$\begin{vmatrix} ২০০০ & ৭ \\ ১৫১ & ৪০ \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} ৪৩১ \\ ? \end{vmatrix} = ১ ১৭$$

ছ'মাস ধরে বিজ্ঞাপন ঘুরে ঘুরে সব ক'টি বড় বড় পত্রিকায় ছাপা হল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। পত্র-পত্রিকায় বিচিত্র সব জিনিস ছাপা হয়। দেশে বাতিকগ্রস্তের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। বাতিকগ্রস্তরা নিজেদের বাতিক অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। এ জন্যে পয়সা খরচ করতে তাদের বাধে না। অংকের বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয়ই এ রকম অংকের বাতিকওয়ালা কেউ দিয়েছে। কিছুদিন পর আবার নতুন কোন ধাঁধা তার মাথায় আসবে। আবার পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেবে।"

মিসির আলি এক সকালে বিজ্ঞাপনটা পড়লেন। কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন, যদি অঙ্ক সমস্যার কোন সমাধান করা যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মিসির আলি সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। কারণ তিনি অতিমানব নন। সাধারণ একজন মানুষ। সুন্দর যুক্তি দাঁড়া করাতে পারেন। সর্বপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এ জগতে কোন রহস্য নেই। কারণ প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না। তারপরেও বারবার প্রকৃতির রহস্যের কাছে তিনি পরাজিত হন। এই পরাজয়ে আনন্দ আছে। সে আনন্দ মিসির আলি পান না। পাঠক হিসেবে আমরা পাই। মিসির আলি চরিত্রটির ধারণা কোত্থেকে পেলাম, কিভাবে পেলাম সেই প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছি। নতুন করে সেই প্রসঙ্গে লিখতে ইচ্ছা করছে না বরং ভূমিকার অংশবিশেষ তুলে দি —

"তখন থাকি নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহরে। এক রাতে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মন্টানায়। গাড়ি চালাচ্ছে আমার স্ত্রী গুলতেকিন। পেছনের সীটে আমি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। গুলতেকিন তখন নতুন ড্রাইভিং শিখেছে। হাইওয়েতে এই প্রথম বের হওয়া। কাজেই কথাবার্তা বলে তাকে বিরক্ত করছি না। চুপ করে বসে আছি এবং খানিকটা আতঙ্কিত বোধ করছি। শুধু মনে হচ্ছে,

অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো। গাড়ির রেডিও অন করা। কান্ট্রি মিউজিক হচ্ছে। ইংরেজি গানের কথা মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে না। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না এই অবস্থা। হঠাৎ গানের একটা কলি শুনে চমকে উঠলাম —

Close your eyes and try to see

বাহ্, মজার কথা তো! আমি নিশ্চিত, মিসির আলি চরিত্রের ধারণা সেই রাতেই আমি পেয়ে যাই। মিসির আলি এমন একজন মানুষ যিনি দেখার চেষ্টা করেন চোখ বন্ধ করে। চোখ খুলেই যেখানে কেউ দেখে না সেখানে চোখ বন্ধ করে পৃথিবী দেখার এক আশ্চর্য ফলবতী চেষ্টা।

মিসির আলিকে নিয়ে লিখলাম অবশ্যি তারো অনেক পরে। প্রথম লেখা উপন্যাস 'দেবী'। মিসির আলি নামের অতি সাধারণ মোড়কে একজন অসাধারণ মানুষ তৈরির চেষ্টা 'দেবী'তে প্রথম করা হয়। মিসির আলি এমন একজন মানুষ যাঁর কাছে প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলাই একমাত্র সত্য। রহস্যময়তায় অস্পষ্ট জগৎ ইনি স্বীকার করেন না। সাধারণত যুক্তিবাদী মানুষ আবেগবর্জিত হন। যুক্তি এবং আবেগ পাশাপাশি চলতে পারে না। মিসির আলির ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রমের চেষ্টা করা হল। যুক্তি ও আবেগকে হাত ধরাধরি করে হাঁটিতে দিলাম। . . ."

মিসির আলিকে নিয়ে আর কি লিখি! সবই তো মনে হয় লেখা হয়ে গেছে। একটা কথা না বললে প্রসঙ্গ অপূর্ণ থাকবে। কথাটা হল — মিসির আলি আমার প্রিয় চরিত্রের একটি। তাঁকে নিয়ে লিখতে আমার সব সময়ই ভাল লাগে। এই নিঃসঙ্গ, হৃদয়বান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির মানুষটি আমাকে সব সময় অভিভূত করেন। যতক্ষণ লিখি, ততক্ষণ তাঁর সঙ্গ পাই। বড় ভাল লাগে।

হিমু

হিমুর ভাল নাম হিমালয়।

বাবা খুব আদর করে ছেলের নাম হিমালয় রাখলেন, যাতে ছেলের হৃদয় হিমালয়ের মত বড় হয়। আকাশ রাখতে পারতেন। আকাশ হিমালয়ের চেয়েও বড়, বিস্তৃত। আকাশ রাখলেন না, কারণ আকাশ স্পর্শ করা যায় না। হিমালয় স্পর্শ করা যায়।

বাবা হিমালয়কে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা করে যদি ডাক্তার, ইন্জিনীয়ার বানানো যায়, তাহলে মহাপুরুষ বানানো যাবে না কেন? ট্রেনিং-এ মহাপুরুষ কেন হবে না? তিনি ছেলেকে মহাপুরুষ

বানানোর বিশেষ ট্রেনিং দেয়া শুরু করলেন। হিমালয় কি মহাপুরুষ হল? না হয়নি। সে যা হয়েছে তা হচ্ছে — 'হিমু'।

হিমুকে নিয়ে প্রথম লিখি ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর পর, দরজার ওপাশে — সর্বশেষ গ্রন্থের নাম — 'হিমু'।

আসলে হিমু কে? খুব সচেতন পাঠক চট করে হিমুকে চিনে ফেলবেন, কারণ হিমু হল মিসির আলির উল্টো পিঠ। বিজ্ঞানের ভাষায় এন্টি-মিসির আলি।

হিমুর কাজকর্ম রহস্যময় জগৎ নিয়ে। সে চলে এন্টি-লজিকে। সে বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে ঘুরে। রাত জেগে পথে পথে হাঁটে কিন্তু সেই সবচে' বেশি অন্তর্মুখী। মিসির আলি চোখ বন্ধ করে পৃথিবী দেখেন। সে চোখ খোলা রাখে কিন্তু কিছুই দেখে না।

মিসির আলি দেখতে কেমন আমি যেমন জানি না, হিমু দেখতে কেমন তাও জানি না। কোন বই-এ হিমুর চেহারার বর্ণনা নেই। যা আছে তাও খুব সামান্য। সে বর্ণনা থেকে চরিত্রের ছবি আঁকা যায় না। আমার নিজের মনে যে ছবিটি ভাসে তা হল — হাসি-খুশি ধরনের একজন যুবকের ছবি। যে যুবকের মুখে আছে কিশোরের সারল্য। শুধু চোখ দু'টি মিসির আলির চোখের মতই তীক্ষ্ণ। তবে এই দু'টি তীক্ষ্ণ চোখে কৌতুক ঝিকমিক করে। যেন সে সবকিছুতেই মজা পায়।

হিমুকে আনতে হয়েছে একটি বিশেষ কারণে। মিসির আলির জগৎ যে একমাত্র জগৎ নয় তা দেখানোর জন্যেই হিমুর প্রয়োজন হল। লজিক খুব ভাল কথা, সেই সঙ্গে এন্টি-লজিকও যে লজিক এই তথ্যটিও মনে রাখা দরকার। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনে এসে পৃথিবী থেমে যায়নি। বস্তুজগতের মূল অনুসন্ধান করতে করতে এখন বিজ্ঞানীরা পাচ্ছেন — আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ . . . হচ্ছে কি এসব! — কোথায় যাচ্ছি আমরা? আমরা কি খুব ধীরে ধীরে লজিকের জগতের বাইরে পা বাড়াচ্ছি না? এই জগতের কথা তো মিসির আলিকে দিয়ে বলানো যাবে না। আমাদের দরকার একজন হিমু।

সম্প্রতি এক ইন্টারভ্যুতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হল — কার প্রভাব আপনার উপর বেশি — হিমুর, না মিসির আলির? আমি একটু থমকে গেলাম। দু'টি চরিত্রই আমার তৈরি। প্রশ্নকর্তার কি উচিত ছিল না জিজ্ঞেস করা — আপনার প্রভাব এই দু'টি চরিত্রের উপর কেমন পড়েছে?

পরক্ষণেই মনে হল প্রশ্নকর্তা ঠিক প্রশ্নই করেছেন — এক সময় আমি এদের সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু এরা এখন আমার পুরো নিয়ন্ত্রণে নেই। এদের ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এরাই বরং এখন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমার নিজের সত্তার ৩০% হিমু, ৩০% মিসির আলি। বাকি চল্লিশ কি আমি জানি না। জানতে চাইও না।

মহামতি ফিহা

আমার লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে ফিহা ঘুরেফিরে আসেন। হিমু এবং মিসির আলির মত তিনি কিন্তু এক ব্যক্তি নন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কোনটাতে তিনি মহাগণিতজ্ঞ। কোনটাতে পদার্থবিদ। যিনি চতুর্মাত্রিক জগতের সন্ধান দিয়েছেন। আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান আমার অতিপ্রিয় বিষয়ের একটি। মহাপুরুষদের জীবনী আমি যতটুকু আগ্রহ নিয়ে পড়ি, মহান বিজ্ঞানীদের জীবনীও ঠিক ততটুকু আগ্রহ নিয়েই পড়ি। সৃষ্টির রহস্য জানার জন্যে যে ব্যাকুলতা বিজ্ঞানীদের মধ্যে কাজ করে সেই ব্যাকুলতা মহাপুরুষদের ব্যাকুলতার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আমি আমার লেখায় ঠিক এই কারণেই মহান বিজ্ঞানীদের ছবি এঁকেছি গভীর মমতায়। যেমন ফিহা। ইনি দেখতে কেমন? চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি ভেসে উঠে তা অনেকটা আইনস্টাইনের ছবির মত। তবে মাথার সব চুল ধবধবে শাদা। চোখে-মুখে একটু রাগী ভঙ্গি আছে। এই রাগী ভঙ্গিটি কেন আছে আমি ঠিক জানি না। ইনি বাস করেন শিশুদের জগতে। কেউ কখনো সেই জগৎ থেকে মহামতি ফিহাকে বের করতে পারে না। মজাটা এখানেই। মিসির আলি, হিমু এবং ফিহাদের একটা জায়গায় মিল — এরা সবাই নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন। সচেতন পাঠকরা এর থেকে কিছু বের করতে পারেন?

জরী, পরী, তিলু, বিলু, নীলু ও রানু

নারী চরিত্রে এই নামগুলি আমি বারবার ব্যবহার করেছি। এবং এখনো করছি। বার বার ব্যবহার করা হলেও এরা একই চরিত্র নয়। আলাদা চরিত্র। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে। এইসব দিনরাত্রির নীলু হল বড় ভাবী। আর নীল হাতীর নীলুর বয়স হল সাত।

সে যাই হোক, আমার নায়িকারা সবাই অসম্ভব 'রূপবতী'। ওরকম কেন? রূপ দেয়ার ক্ষমতা যখন আমার হাতে তখন কেন জানি কার্পণ্য করতে ইচ্ছে করে না।

আমার ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যত লেখালেখি তার বেশির ভাগ নায়িকা পরী, তিলু, বিলু, নীলু, রানু। নামগুলি সহজ এবং ঘরোয়া। ব্যবহার করতে ভাল লাগে। খুব পরিচিত মনে হয়।

ছাব্বিশ বছর বয়সে একটি বালিকার সঙ্গে পরিচয় হবার পর নতুন একজন নায়িকা লেখায় উঠে আসে। তার নাম জরী। বলাই বাহুল্য, সেও অসম্ভব রূপবতী। এই নায়িকা আমার পরবর্তী সব লেখাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। কারণ যে বালিকার ছায়া দিয়ে জরী নামক চরিত্রের সৃষ্টি, সেই বালিকাটি আমার

জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সাতাশ বছর বয়সে তাকে আমি বিয়ে করি। তখন তার বয়স মাত্র পনেরো। এই মেয়েটি আমার লেখালেখিতে খুব কাজে আসে। না, রাত জেগে চা বানানোর কথা বলছি না। আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই বলেই কিশোরীর বিচিত্র মনোজগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। একজন কিশোরীর তরুণীতে রূপান্তরের সেই বিস্ময়কর প্রক্রিয়াটিও দেখা হয়। সবই উঠে আসে লেখায়।

আমার প্রথম দিকের লেখায় নায়িকাদের বয়স খুব কম — কারণ আমার স্ত্রী, তার বয়স কম। আস্তে আস্তে আমার নায়িকাদের বয়স বাড়ে, কারণ আমার স্ত্রীর বয়স বাড়ছে। ইদানিংকালের উপন্যাসে আমার নায়িকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। কারণ গুলতেকিন (আমার স্ত্রীর কথা বলছি) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। তাহলে কি এই দাঁড়াবে যে সে যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তখন আমার নায়ক–নায়িকারা হবে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা?

নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দেই — না তা কেন হবে? আমার মেয়েরা এখন বড় হচ্ছে। আবারো খুব কাছ থেকে তাদের দেখছি। এরা হবে আমার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের নায়িকা।

এখনো আমার কত কথা জমা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কিছুই তো বলা হয়নি, অথচ সময় কত দ্রুত চলে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়েছিলাম। সেই ছুটিও ফুরিয়ে যাচ্ছে, অথচ একটি পৃষ্ঠাও লেখা হয়নি। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। বুকের ভেতর ধক্ করে উঠে। মনে হয় —

"ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে।"

আমি প্রার্থনা করি — হে মঙ্গলময়, তুমি আমাকে শক্তি দাও। ক্ষমতা দাও যেন আমি আমার কাজ শেষ করতে পারি। তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।

গুলতেকিন একসময় জেগে উঠে বলে, কি হয়েছে?

আমি হেসে তাকে আশ্বস্ত করি। সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আমি জেগে থাকি। আমার ঘুম আসে না।

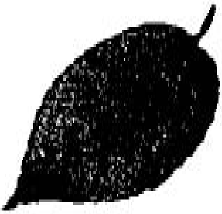

বর্ষাযাপন

কয়েক বৎসর আগের কথা। ঢাকা শহরের এক কম্যুনিটি সেন্টারে বিয়ে খেতে গিয়েছি। চমৎকার ব্যবস্থা। অতিথির সংখ্যা কম। প্রচুর আয়োজন। থালা-বাসনগুলি পরিচ্ছন্ন। যারা পোলাও খাবেন না তাঁদের জন্যে সরু চালের ভাতের ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখলাম বেশকিছু বিদেশী মানুষও আছেন। তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহী। দেখাবার মত কোন অনুষ্ঠান নেই বলে কন্যা-কর্তা খানিকটা বিব্রত। এটা শুধুমাত্র খাওয়ার অনুষ্ঠান তা বলতে বোধহয় কন্যা-কর্তার খারাপ লাগছে। বিদেশীরা যতবারই জানতে চাচ্ছে, মূল অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে? ততবারই তাঁদের বলা হচ্ছে, হবে হবে।

কোণার দিকের একটা ফাঁকা টেবিলে খেতে বসেছি। আমার পাশের চেয়ারে এক বিদেশী ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমার কিছুটা মেজাজ খারাপ হল। মেজাজ খারাপ হবার প্রধান কারণ — ইনি সঙ্গে করে কাঁটা চামচ নিয়ে এসেছেন। এঁদের এই আদিখ্যেতা সহ্য করা মুশকিল। কাঁটা চামচ নিশ্চয়ই এখানে আছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি আগেও লক্ষ করেছি, যারা কাঁটা চামচ দিয়ে খায় তারা হাতে যারা খায় তাদের বর্বর গণ্য করে। যেন সভ্য জাতির একমাত্র লগো হল কাঁটা চামচ। পাশের বিদেশী তাঁর পরিচয় দিলেন। নাম পল অরসন। নিবাস নিউমেক্সিকোর লেক সিটি। কোন এক এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশে এসেছেন অল্প দিন হল। এখনো ঢাকার বাইরে যাননি। বিমানের টিকিট পাওয়া গেলে সামনের সপ্তাহে কক্সবাজার যাবেন।

কিছু জিজ্ঞেস না করলে অভদ্রতা হয় বলেই বললাম, বাংলাদেশ কেমন লাগছে?

পল অরসন চোখ বড় বড় করে বলল, **Oh, wonderful!**

এদের মুখে Oh wonderful শুনে আহ্লাদিত হবার কিছু নেই। এরা এমন বলেই থাকে। এরা যখন এদেশে আসে তখন তাদের বলে দেয়া হয়, নরকের মত একটা জায়গায় যাচ্ছ। প্রচণ্ড গরম। মশা-মাছি। কলেরা-ডায়রিয়া। মানুষগুলিও খারাপ। বেশির ভাগই চোর। যারা চোর না তারা ঘুষখোর। এরা প্রোগ্রাম করা অবস্থায় আসে, সেই প্রোগ্রাম ঠিক রেখেই বিদেয় হয়। মাঝখানে Oh wonderful জাতীয় কিছু ফাঁকা বুলি আওড়ায়।

আমি পল অরসনের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললাম, তুমি যে ওয়ান্ডারফুল বললে, শুনে খুশি হলাম। বাংলাদেশের কোন্‌ জিনিসটা তোমার কাছে ওয়ান্ডারফুল মনে হয়েছে?

পল বলল, তোমাদের বর্ষা।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। এ বলে কি। আমি আগ্রহ নিয়ে পলের দিকে তাকালাম। পল বলল, বৃষ্টি যে এত সুন্দর হতে পারে এদেশে আসার আগে আমি বুঝতে পারিনি। বৃষ্টি মনে হয় তোমাদের দেশের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রিকশার হুড ফেলে মতিঝিল থেকে গুলশানে গিয়েছি। আমার রিকশাওয়ালা ভেবেছে, আমি পাগল।

আমি পলের দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, তোমার কথা শুনে খুব ভাল লাগল। অনেক বিদেশীর অনেক সুন্দর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার মত সুন্দর কথা আমাকে এর আগে কেউ বলেনি। এত চমৎকার একটি কথা বলার জন্যে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হল।

পল অবাক হয়ে বলল, আমি কি অপরাধ করেছি?

'পকেট থেকে কাঁটা চামচ বের করে অপরাধ করেছ।'

পল হো-হো করে হেসে ফেলল। বিদেশীরা এমন প্রাণখোলা হাসি হাসে না বলেই আমার ধারণা। পল অরসনের আরো কিছু ব্যাপার আমার পছন্দ হল। যেমন, খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, নাও, সিগারেট নাও।

বিদেশীরা এখন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে। তারা সিগারেট তৈরি করে গরিব দেশগুলিতে পাঠায়। নিজেরা খায় না। ভাবটা এরকম — অন্যরা মরুক, আমরা বেঁচে থাকব। তারপরেও কেউ কেউ খায়। তবে তারা কখনো অন্যদের সাধে না।

আমি পলের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। পানের ডালা সাজানো ছিল। পল নিতান্ত পরিচিত ভঙ্গিতে পান মুখে দিয়ে চুন খুঁজতে লাগল। এধরনের সাহেবদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। বর্ষা নিয়েই কথা বলা যেতে পারে। তাছাড়া গরম

পড়েছে প্রচণ্ড। এই গরমে বৃষ্টির কথা ভাবতেও ভাল লাগে। আমি বললাম, পল, তোমার বর্ষা কখন ভাল লাগল?

পল অরসন অবিকল বৃদ্ধা মহিলাদের মত পানের পিক ফেলে হাসিমুখে বলল, সে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছি দুপুরে। প্লেন থেকে নেমেই দেখি প্রচণ্ড রোদ, প্রচণ্ড গরম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, সর্বনাশ হয়েছে! এই দেশে থাকব কি করে? শনানীতে আমার জন্যে বাসা ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেখানে এয়ারকুলার আছে বলে আমাকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে। আমি ভাবছি, কোনমতে বাসায় পৌঁছে এয়ারকুলার ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকব। ঘরে কোন চৌবাচ্চা থাকলে সেখানেও গলা ডুবিয়ে বসে থাকা যায়।

বাসায় পৌঁছে দেখি, এয়ারকুলার নষ্ট। সারাই করার জন্যে ওয়ার্কশপে দেয়া হয়েছে। মেজাজ কি যে খারাপ হল বলার না। ছটফট্ করতে লাগলাম। এক ফোঁটা বাতাস নেই। ফ্যান ছেড়ে দিয়েছি, ফ্যানের বাতাসও গরম।

বিকেলে এক মিরাক্কল ঘটে গেল। দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘ। আমার বাবুর্চি ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, কালবোশেখি কামিং স্যার। ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। মনে হল, আনন্দজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝপ করে গরম কমে গেল। হিম-শীতল হাওয়া বইতে লাগল। শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর নামল বৃষ্টি। প্রচণ্ড বর্ষণ, সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বাবুর্চি ইয়াছিন ছুটে এসে বলল, স্যার, শিল পড়তাছে, শিল। বলেই ছাদের দিকে ছুটে গেল। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে। ছাদে উঠে দেখি, চারদিকে মহা আনন্দময় পরিবেশ। আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করে শিল কুড়াচ্ছে। আমি এবং আমার বাবুর্চি আমরা দু'জনে মিলে এক ব্যাগ শিল কুঁড়িয়ে ফেললাম। আমি ইয়াছিনকে বললাম, এখন আমরা এগুলি দিয়ে কি করব?

ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, ফেলে দিব।

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। প্রথম তুষারপাতের সময় আমরা তুষারের ভেতর ছোটাছুটি করতাম। তুষারের বল বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে দিতাম। এখানেও তাই হচ্ছে। সবাই বৃষ্টির পানিতে ভিজে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

আমি পলকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

এসো কর স্নান নবধারা জলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে।

পল বলল, তুমি কি বললে?

'রবীন্দ্রনাথের গানের দু'টি লাইন বললাম। তিনি সবাইকে আহ্বান করছেন — বর্ষার প্রথম জলে স্নান করার জন্যে।'

'বল কি! তিনি সবাইকে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি আর কি বলেছেন?'

'আরো অনেক কিছুই বলেছেন। তাঁর কাব্যের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে বর্ষা।'

'বল কি!'

'শুধু তাঁর না, এদেশে যত কবি জন্মেছেন তাঁদের সবার কাব্যের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে বর্ষা।'

পল খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, বর্ষা নিয়ে এ পর্যন্ত লেখা সবচে' সুন্দর কবিতাটি আমাকে বল তো, প্লীজ।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম,

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

'এই এক লাইন?'

'হ্যাঁ, এক লাইন।'

'এর ইংরেজি কি?'

'এর ইংরেজি হয় না।'

'ইংরেজি হবে না কেন?'

'আক্ষরিক অনুবাদ হয়। তবে তার থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে —

Patter patter rain drops, flood in the river.'

পল বিস্মিত হয়ে বলল, আমার কাছে তো মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ একটা লাইন।

'সাধারণ তো বটেই। তবে অন্যরকম সাধারণ। এই একটি লাইন শুনলেই আমাদের মনে তীব্র আনন্দ এবং তীব্র ব্যথাবোধ হয়। কেন হয় তা আমরা নিজেরাও ঠিক জানি না।'

পল হা করে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, বর্ষা সম্পর্কে এরকম মজার আর কিছু আছে?

আমি হাসিমুখে বললাম, বর্ষার প্রথম মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু মাছের মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। তারা পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে

আসে।

'আশা করি তুমি আমার লেগ পুলিং করছ না।'

'না, লেগ পুলিং করছি না। আমাদের দেশে এরকম ফুল আছে যা শুধু বর্ষাকালেই ফুটে। অদ্ভুত ফুল। পৃথিবীর আর কোন ফুলের সঙ্গে এর মিল নেই। দেখতে সোনালি একটা টেনিস বলের মত। যতদিন বর্ষা থাকবে ততদিন এই ফুল থাকবে। বর্ষা শেষ, ফুলও শেষ।'

'ফুলের নাম কি?'

'কদম।'

আমি বললাম, এই ফুল সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার হল — বর্ষার প্রথম কদম ফুল যদি কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দেয় তাহলে তাদের সম্পর্ক হয় বিষাদমাখা। কাজেই এই ফুল কেউ কাউকে দেয় না।

'এটা কি একটা মীথ?'

'হ্যাঁ, মীথ বলতে পার।'

পল তার নোটবই বের করে কদম ফুলের নাম লিখে নিল। আমি সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের চারটি চরণও লিখে দিলাম।

তুমি যদি দেখা না দাও
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।

**(If thou showest me not thy face,
If thou leavest me wholly aside,
I know not how I am to pass
These long rainy hours.)**

পল অরসনের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তবে ঘোর বর্ষার সময় আমি যখন রাস্তায় থাকি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাই, যদি রিকশার হুড-ফেলা অবস্থায় ভিজতে ভিজতে কোন সাহেবকে যেতে দেখা যায়।

ফ্রাংকেনস্টাইন

আমি কি করে এক দানব তৈরি করলাম সেই গল্প আপনাদের বলি। অয়োময়ের পর দু'বছর কেটে গেছে। হাতে কিছু সময় আছে। ভাবলাম সময়টা কাজে লাগানো যাক। টিভির বরকতউল্লাহ্ সাহেব অনেক দিন থেকেই তাঁকে একটা নাটক দেবার কথা বলছেন। ভাবলাম ছয় সাত এপিসোডের একটা সিরিজ নাটক তাঁকে দিয়ে আবার শুরু করা যাক। এক সকালবেলা তাঁর সঙ্গে চা খেতে খেতে সব ঠিক করে ফেললাম। নাটক লেখা হবে ভূতপ্রেত নিয়ে। নাম ছায়াসঙ্গী। দেখলাম নাটকের বিষয়বস্তু শুনে তিনি তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। আমি বললাম, ভাই আপনি কিছু ভাববেন না। এই নাটক দিয়ে আমরা লোকজনদের এমন ভয় পাইয়ে দেব যে তারা রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে পারবে না।

বরকতউল্লাহ্ সাহেব বিরস গলায় বললেন, মানুষদের ভয় দেখিয়ে লাভ কি?

অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রশ্ন। যেভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন তাতে যে কেউ ঘাবড়ে যাবে। আমি অবশ্যি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হলাম যে ভয় পাবার মধ্যেও আনন্দ আছে। কে না জানে সুকুমার কলার মূল ব্যাপারটাই হল আনন্দ। বরকতউল্লাহ সাহেব নিমরাজি হলেন। আমি পরদিনই গা ছমছমানো এক ভূতের নাটক নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত। নাটক পড়ে শুনালাম। নিজের নাটক পড়ে আমার নিজেরই গা ছমছম করতে লাগলো। বরকতউল্লাহ্ সাহেব বললেন, অসম্ভব! এই নটিক বানানোর মত টেকনিক্যাল সাপোর্ট আমাদের নেই। আপনি সহজ কোন নাটক দিন।

আমার মনটাই গেল খারাপ হয়ে। আমি বললাম, দেখি।

'দেখাদেখি না। আপনাকে আজই নাটকের নাম দিতে হবে। টিভি গাইডে নাম ছাপা হবে।'

আমি একটা কাগজ টেনে লিখলাম, কোথাও কেউ নেই।

বরকত সাহেব বললেন, কোথাও কেউ নেই মানে কি? আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।

আমি বললাম, এটাই আমার নাটকের নাম। এই নামে আমার একটা উপন্যাস আছে। উপন্যাসটাই আমি নাটকে রূপান্তরিত করে দেব।

বরকত সাহেব আঁৎকে উঠে বললেন, না না, নতুন কিছু দিন। উপন্যাস তো অনেকের পড়া থাকবে। গল্প আগেই পত্রিকায় ছাপা হয়ে যাবে।

আমি বললাম, এটা আমার খুব প্রিয় লেখার একটি। আপনি দেখুন সুবর্ণাকে পাওয়া যায় কি না। সুবর্ণাকে যদি পাওয়া যায় তাহলে কম পরিশ্রমে সুন্দর একটা নাটক দাঁড়া হবে।

'সুবর্ণাকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে কি আপনি নতুন নাটক লিখবেন?'

'হ্যাঁ লিখব।'

সুবর্ণাকে পাওয়া গেল। আসাদুজ্জামান নূর বললেন, তিনি বাকেরের চরিত্রটি করতে চান। বাকেরের চরিত্রটি তাঁকেই দেয়া হল। 'ফ্রাংকেনস্টাইন' তৈরির দিকে আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম। বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইনের দানবটা তো মানুষ এক নামে চেনে। বাকের হল সেই 'ফ্রাংকেনস্টাইন'।

নাটকটির সপ্তম পর্ব প্রচারের পর থেকে আমি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। সবাই জানতে চাচ্ছে বাকেরের ফাঁসি হবে কি না। রোজ গাদা-গাদা চিঠি। টেলিফোনের পর টেলিফোন। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এই ব্যাকুলতার মানেটা কি? আমি নাটক লিখতে গিয়ে মূল বই অনুসরণ করছি। বই-এ বাকেরের ফাঁসি আছে। নাটকেও তাই হবে। যারা আমাকে চিঠি লিখেছেন তাদের সবাইকেই আমি জানালাম, হ্যাঁ ফাঁসি হবে। আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাকেরকে ফাঁসিতে না ঝুলালে সেই বক্তব্য আমি দিতে পারব না। তাছাড়া আমাকে মূল বই অনুসরণ করতে হবে।

এক অধ্যাপিকা আমাকে জানালেন — 'শেক্সপিয়রের রোমিও জুলিয়েট বিয়োগান্তক লেখা। কিন্তু যখন রোমিও জুলিয়েট ছবি করা হল তখন নায়ক, নায়িকার মিল দেখানো হল। আপনি কেন দেখাবেন না? আপনাকে দেখাতেই হবে'।

একি যন্ত্রণা!

তবে এটা যন্ত্রণার শুধু শুরু। তবলার ঠুকঠাক। মূল বাদ্য শুরু হল নবম পর্ব প্রচারের পর। আমি দশ বছর ধরে টিভিতে নাটক লিখছি এই ব্যাপার আগে দেখিনি। পোস্টার, মিটিং, মিছিল — 'হুমায়ূনের চামড়া তুলে নেব আমরা।' রাতে ঘুমুতে পারি না, দুটা তিনটায় টেলিফোন। কিছু টেলিফোন তো রীতিমত ভয়াবহ — 'বাকের ভাইয়ের কিছু হলে রাস্তায় লাশ পড়ে যাবে।' আপাত দৃষ্টিতে এইসব কাণ্ড,

ব্যাপারখানা আমার খারাপ লাগার কথা নয়, বরং ভাল লাগাই স্বাভাবিক। আমার একটি নাটক নিয়ে এতসব হচ্ছে এতে অহংবোধ তৃপ্ত হওয়ারই কথা। আমার তেমন ভাল লাগল না। আমার মনে হল একটা কিছু ব্যাপার আমি ধরতে পারছি। দর্শক রূপকথা দেখতে চাচ্ছে কেন? তারা কেন তাদের মতামত আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে? আমি কি লিখব বা না লিখব সেটা তো আমি ঠিক করব। অন্য কেউ আমাকে বলে দেবে কেন?

বাকেরের মত মানুষদের কি ফাঁসি হচ্ছে না?

এ দেশে কি সাজানো মামলা হয় না?

নিরপরাধ মানুষ কি ফাঁসির দড়িতে ঝুলে না?

ঐ তো সেদিনই পত্রিকায় দেখলাম ৯০ বছর পর প্রমাণিত হল লোকটি নির্দোষ। অথচ হত্যার দায়ে ৪০ বছর আগেই তার ফাঁসি হয়ে গেছে।

সাহিত্যের একটি প্রচলিত ধারা আছে যেখানে সত্যের জয় দেখানো হয়। অত্যাচারী মোড়ল শেষ পর্যায়ে এসে মৃত্যুবরণ করেন জাগ্রত জনতার কাছে। বাস্তব কিন্তু সেরকম নয়। বাস্তবে অধিকাংশ সময়েই মোড়লরা মৃত্যুবরণ করেন না। বরং বেশ সুখে-শান্তিতেই থাকেন। ৭১-এর রাজাকাররা এখন কি খুব খারাপ আছেন? আমার তো মনে হয় না। কুত্তাওয়ালীরা মরেন না, তাদের কেউ মারতে পারে না। ক্ষমতাবান লোকদের নিয়ে তারা মজ্জব বসায়। দূর থেকে আমাদের তারা নিয়ন্ত্রণ করে।

আমি আমার নাটকে কুত্তাওয়ালীর প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে চেয়েছি। তৈরি করেছিও। কুত্তাওয়ালীকে মেরে ফেলে কিন্তু সেই ঘৃণা আবার কমিয়েও দিয়েছি। আমরা হাঁপ ছেড়ে ভেবেছি — যাক দুষ্ট শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু কুত্তাওয়ালী যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমাদের ঘৃণা থেমে যেত না, প্রবহমান থাকতো। দর্শকরা এক ধরনের চাপ নিয়ে ঘুমুতে যেতেন।

আমার মূল উপন্যাসে কুত্তাওয়ালীর মৃত্যু হয়নি, নাটকে হয়েছে। কেন হয়েছে? হয়েছে, কারণ মানুষের দাবীর কাছে আমি মাথা নত করেছি। কেনই বা করব না? মানুষই তো সব, তাদের জন্যেই তো আমার লেখালেখি। তাদের তীব্র আবেগকে আমি মূল্য দেব না তা তো হয় না। তবে তাঁদের আবেগকে মূল্য দিতে গিয়ে আমার কষ্ট হয়েছে। কারণ আমি জানি, আমি যা করছি তা ভুল। আমার লক্ষ্য মানুষের বিবেকের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সেই চাপ সৃষ্টি করতে হলে দেখাতে হবে যে কুত্তাওয়ালীর বেঁচে থাকে। মারা যায় বাকেররা।

যে কারণে নাটকে কুত্তাওয়ালীর বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই কারণেই বাকেরের মৃত্যুরও প্রয়োজন ছিল। বাকেরের মৃত্যু না হলে আমি কিছুতেই দেখাতে

পারতাম না যে এই সমাজে কত ভয়াবহ অন্যায় হয়। আপনাদের কি মনে আছে যে একজন মানুষ (?) পনেরো বছর জেলে ছিল যার কোন বিচারই হয়নি। কোর্টে তার মামলাই ওঠেনি। ভিন দেশের কোন কথা না। আমাদের দেশেরই কথা।

ভয়াবহ অন্যায়গুলি আমরাই করি। আমাদের মত মানুষরাই করে এবং করায়। কিছু কিছু মামলায় দেখা গেছে পুলিশ অন্যায় করে, পোস্টমর্টেম যে ডাক্তার করেন তিনি অন্যায় করেন, ধুরন্ধর উকিলরা করেন। রহিমের গামছা চলে যায় করিমের কাঁধে।

পত্রিকায় দেখলাম, ১৮৩ জন আইনজীবী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আমি নাকি এই নাটকে খারাপ উকিল দেখিয়ে তাঁদের মর্যাদাহানি করেছি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা না করলে তারা আদালতের আশ্রয় নেবেন। উকিল সাহেবদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, এই নাটকে একজন অসম্ভব ভাল উকিলও ছিলেন। মুনার উকিল। যিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার। একশত আশিজন আইনজীবী নিজেদেরকে সেই উকিলের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে বদ উকিলের সঙ্গে করলেন। কেন?

আমাদের সমাজে কি কুত্তাওয়ালীর উকিলের মত উকিল নেই? এমন আইনজীবী কি একজনও নেই যারা দিনকে রাত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন না? মিথ্যা সাক্ষী কি আইনজীবীদেরই কেউ কেউ তৈরি করে দেন না? যদি না দেন, তা হলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেন কাঁদে?

অতি অল্পতেই দেখা যাচ্ছে সবার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আমরা কি করি না করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের ভাবমূর্তি বজায় থাকলেই হল। হায়রে ভাবমূর্তি!

আমি মনে হয় মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নাটকটির শেষ পর্যায়ে আমি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন করলাম। শেষ পর্বের জন্যে আমি দুঘন্টা সময় চাইলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল প্রথম এক ঘন্টায় শুধু কোর্ট দেখাব, পরের এক ঘন্টা যাবে বাকি নাটক। কোর্ট দৃশ্যের পর পনেরো দিন অপেক্ষা করা দর্শকের জন্যে কষ্টকর, নাটকের জন্যেও শুভ নয়। যে টেনশান কোর্ট দৃশ্যে তৈরি হবে, পনেরো দিনের বিরতিতে তা নিচে নেমে যাবে। টেনশান তৈরি করতে হবে আবার গোড়া থেকে। আমার বিশ্বাস ছিল টেলিভিশন আমার যুক্তি মেনে নেবে। অতীতে আমার 'অয়োময়' নাটকের শেষ পর্বের জন্য দুঘন্টা সময় দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া আমার সবসময় মনে হয়েছে, টেলিভিশনের উপর আমার খানিকটা দাবী আছে। গত দশ বছরে টিভির জন্যে কম সময় তো দেইনি। আবেদনে লাভ হল না। টিভি জানিয়ে দিল — এই নাটকের

জন্যে বাড়তি সময় দেয়া হবে না। দর্শকদের জন্যে টিভি, টিভির জন্যে দর্শক নয় — — এই কথাটা টিভির কর্তাব্যক্তিরা কবে বুঝবেন কে জানে। আমি ৭০ মিনিটে গল্পের শেষ অংশ বলার প্রস্তুতি নিলাম। কোর্টের দৃশ্য, কুত্তাওয়ালীর হত্যা দৃশ্য, বাকেরের ফাঁসি সব এর মধ্যেই দেখাতে হবে। শুধু দেখালেই হবে না — সুন্দর করে দেখাতে হবে। দর্শকদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে গভীর বেদনাবোধ।

সন্ধ্যাবেলা হাত-মুখ ধুয়ে লিখতে বসলাম, রাতে ভাত খেতে গেলাম না। পুরোটা এক বৈঠকে বসে শেষ করতে হবে। রাত তিনটায় লেখা শেষ হল। আমি পড়তে দিলাম আমার স্ত্রী গুলতেকিনকে। সে বলল, তোমার কোন একটা সমস্যা আছে। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। আমি লক্ষ করেছি, তুমি অনেকখানি মমতা দিয়ে একটি চরিত্র তৈরি কর, তারপর তাকে মেরে ফেল। তুমি এই সব দিন রাত্রিতে টুনিকে মেরেছ। এবার মারলে বাকেরকে।

আমি তাকে কোন যুক্তি দিলাম না। ক্লান্ত হয়ে ঘুমুতে গেলাম। ঘুম হল না। আবার উঠে এসে বারান্দায় বসলাম। অনেকদিন পর ভোর হওয়া দেখলাম। ভোরের প্রথম আলো মনের অস্পষ্টতা কাটাতে সাহায্য করে। আমার বেলাতেও করলো। আমার মন বলল, আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বাকেরকে মরতেই হবে।

যেদিন নাটক প্রচারিত হবে তার আগের দিন রাতে দৈনিক বাংলার আমার সাংবাদিক বন্ধু হাসান হাফিজ ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করলেন। আমাকে বললেন, আগামীকাল প্রেসক্লাবের সামনে বাকের ভাইয়ের মুক্তির দাবীতে সমাবেশ হবে। সেখান থেকে তারা আপনার এবং বরকতউল্লাহ সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করবে। পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। আপনি সরে যান।

নিজের ঘরে বসে সবাইকে নিয়ে আমার নাটক দেখার অভ্যাস। এই প্রথমবার নাটক প্রচারের দিন বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যেতে হল। খবর নিয়ে জানলাম, বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকটা ককটেল ফাটানো হয়েছে। রাগী কিছু ছেলে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশ চলে এসেছে। বাসায় ফিরলাম রাত একটায়। দরজার ফাঁক দিয়ে কারা যেন দু'টা চিঠি রেখে গেছে। একটা চিঠিতে লেখা, 'বাকেরের যেভাবে মৃত্যু হল আপনার মৃত্যুও ঠিক সেইভাবেই হবে। আমরা আপনাকে ক্ষমা করলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।' রাত দু'টার সময় ধানমন্ডি থানার একজন সাব ইন্সপেক্টর সাহেব আমাকে জানালেন, আপনি কোন ভয় পাবেন না। আমরা আছি।

প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে রাতে ঘুমুতে গেলাম। এপাশ-ওপাশ করছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমার ছোট মেয়েটাও জেগে আছে। সেও ঘুমুতে পারছে না। তার নাকি বাকের ভাইয়ের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় এসে

বসলাম। মেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবা তুমি উনাকে কেন মেরে ফেললে? আমি মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, গল্পের একজন বাকের মারা গেছে যাতে সত্যিকার বাকেররা কখনো না মারা যায়।

কথাটা হয়তো আমার ক্লাস ফোরে পড়া মেয়ের জন্যে একটু ভারী হয়ে গেল। ভারী হলেও এটাই আমার কথা। এই কথা নাটকের ভেতর দিয়ে যদি বুঝাতে না পেরে থাকি তবে তা আমার ব্যর্থতা। আমি আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করেছি। আমার চেষ্টায় কোন খাদ ছিল না। এইটুকু আমি আপনাদের বলতে চাই। বাকেরের মৃত্যুতে আপনারা যেমন ব্যথিত আমিও ব্যথিত। আমার ব্যথা আপনাদের ব্যথার চেয়েও অনেক অনেক তীব্র। বিজ্ঞানী ডঃ ফ্রাংকেনস্টাইন নিজের তৈরি দানবটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে নিজেই ধ্বংস হলেন নিজের সৃষ্টির হাতে। আমি বেঁচে আছি। কিন্তু বাকের নামের একটি চরিত্রও তৈরি করেছিলাম। আজ সে নেই। মুনা আছে, সে কোনদিনই বাকেরকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে পারবে না। মুনার এই কষ্ট আমি বুকে ধারণ করে আছি। আপনারা ভুলে যাবেন। আমি তো ভুলব না। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে মুনার কষ্ট হৃদয়ে ধারণ করে।

চান্নিপসর রাইত

আলাউদ্দিন নামে আমার নানাজানের একজন কামলা ছিল। তাকে ডাকা হত আলাদ্দি। কামলা শ্রেণীর লোকদের পুরো নামে ডাকার চল ছিল না। পুরো নাম ভদ্রলোকদের জন্যে। এদের আবার নাম কি? একটা কিছু ডাকলেই হল। 'আলাদ্দি' যে ডাকা হচ্ছে এই-ই যথেষ্ট।

আলাউদ্দিনের গায়ের রঙ ছিল কুচকুচে কালো। এমন ঘন কৃষ্ণবর্ণ সচরাচর দেখা যায় না। মাথাভর্তি ছিল বাবরি চুল। তার চুলের যত্ন ছিল দেখার মত। জবজবে করে তেল মেখে মাথাটাকে সে চকচকে রাখতো। আমাকে সে একবার কানে কানে বলল, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, মানুষের পরিচয় হইল চুলে। যার চুল ঠিক তার সব ঠিক।

কামলাদের মধ্যে আলাউদ্দিন ছিল মহা ফাঁকিবাজ। কোন কাজে তাকে পাওয়া যেত না। শীতের সময় গ্রামে যখন যাত্রা বা গানের দল আসতো তখন সে অবধারিতভাবে গানের দলের সঙ্গে চলে যেত। মাসখানিক তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। অথচ শীতের মরশুম হচ্ছে আসল কাজের সময়। এমন ফাঁকিবাজকে কেউ জেনে-শুনে কামলা নেবে না। নানাজান নিতেন, কারণ তাঁর উপায় ছিল না। আলাউদ্দিন বৈশাখ মাসের শুরুতে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে চোখে সুরমা দিয়ে উপস্থিত হত। নানাজানের পা ছুঁয়ে সালাম করে তৃপ্ত গলায় বলতো, মামুজী, দাখিল হইলাম।

নানাজান চেঁচিয়ে বলতেন, যা হারামজাদা, ভাগ।

আলাউদ্দিন উদাস গলায় বলতো, ভাইগ্যা যামু কই? আল্লাপাক কি আমার যাওনের যায়গা রাখছে? রাখে নাই। তার উপরে একটা নয়ন নাই। নয়ন দুইটা ঠিক থাকলে হাঁটা দিতাম। অফমান আর সহ্য হয় না।

এর উপর কথা চলে না। তাকে আবারো এক বছরের জন্যে রাখা হত। বারবার

সাবধান করে দেয়া হত যেন গানের দলের সঙ্গে পালিয়ে না যায়। সে আল্লার নামে, পাক কোরানের নামে, নবীজীর নামে কসম কাটতো — আর যাবে না।

'মামুজী, আর যদি যাই তাইলে আপনের গু খাই।'

সবই কথার কথা। গানের দলের সঙ্গে তার গৃহত্যাগ ছিল নিয়তির মতো। ফেরানোর উপায় নেই। নানাজান তা ভালমতই জানতেন। বড় সংসারে অকর্মা কিছু লোক থাকেই। এদের উপদ্রব সহ্য করতেই হয়।

আলাউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয় নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। আমরা থাকতাম শহরে। বাবা ছুটি-ছাটায় আমাদের নানার বাড়ি নিয়ে যেতেন। আমরা অল্প কিছুদিন থাকতাম। এই সময়টা সে আমাদের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকতো। রাতে গল্প শোনাতো। সবই তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প। তার চেয়েও যা মজার তা হল, তার প্রতিটি গল্পের শুরু চান্নি পসর রাইতে।

'বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, সেইটা ছেল চান্নি পসর রাইত। আহারে কি চান্নি। আসমান যেন ফাইট্যা টুকরা টুকরা হইয়া গেছে। শইলের লোম দেহা যায় এমুন চান্দের তেজ।'

সাধারণত ভূত-প্রেতের গল্পে অমাবস্যার রাত থাকে। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে অন্ধকার রাতের দরকার হয়। কিন্তু আলাউদ্দিনের ভূতগুলিও বের হয় চান্নি পসর রাতে। যখন সে বাঘের গল্প বলে, তখন দেখা যায় তার বাঘও চান্নি পসর রাতে পানি খেতে বের হয়।

ছোটবেলায় আমার ধারণা হয়েছিল, এটা তার মুদ্রাদোষ। গল্পে পরিবেশ তৈরির এই একটি কৌশলই সে জানে। দুর্বল গল্পকারের মত একই টেকনিক সে বারবার ব্যবহার করে।

একটু যখন বয়স হল তখন বুঝলাম চাঁদনি পসর রাত আলাউদ্দিনের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় বলেই এই প্রসঙ্গে সে বারবার ফিরে আসে। সব কিছুই সে বিচার করতে চায় চান্নি পসর রাতের আলোকে। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। নানাজানদের গ্রামের স্কুলের সাহায্যের জন্য একটা গানের আসর হল। কেন্দুয়া থেকে দু'জন বিখ্যাত বয়াতী আনা হল। হ্যাজাক লাইট-টাইট জ্বালিয়ে বিরাট ব্যাপার। গান হলও খুব সুন্দর। সবাই মুগ্ধ। শুধু আলাউদ্দিন দুঃখিত গলায় জনে জনে বলে বেড়াতে লাগলো, হ্যাজাক বাত্তি দিয়া কি আর গান হয়? এই গান হওয়া উচিত ছিল চান্নি পসর রাইতে। বিরাট বেকুবি হইছে।

সৌন্দর্য আবিষ্কার ও উপলব্ধির জন্যে উন্নত চেতনার প্রয়োজন। তাহলে কি ধরে নিতে হবে আমাদের আলাউদ্দিন উন্নত চেতনার অধিকারী ছিল? যে সৌন্দর্যের উপাসক সে সবকিছুতেই সৌন্দর্য খুঁজে পায়। আলাউদ্দিন তো তা পায়নি। তার

সৌন্দর্যবোধ চান্নি পসর রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন তো হবার কথা না। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো আলাউদ্দিনের জোছনা-প্রীতির অন্য ব্যাখ্যা দেবেন। তারা বলবেন — এই লোকের অন্ধকার-ভীতি আছে। চাঁদের আলোর জন্যে তার এই আকুলতার পেছনে আছে তার আঁধার-ভীতি Dark Fobia. যে যাই বলুন, আমাকে জোছনা দেখাতে শিখিয়েছে আলাউদ্দিন। রূপ শুধু দেখলেই হয় না। তীব্র অনুভূতি নিয়ে দেখতে হয়। এই পরম সত্য আমি জানতে পারি মহামূর্খ বলে পরিচিত বোকা-সোকা একজন মানুষের কাছে। আমার মনে আছে, সে আমাকে এক জোছনা রাতে নৌকা করে বড় গাঙে নিয়ে গেল। যাবার পথে ফিসফিস করে বলল, চান্নি পসর দেখন লাগে পানির উফরে, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা। পানির উফরে চান্নির খেলাই অন্য রকম।

সেবার নদীর উপর চাঁদের ছায়া দেখে তেমন অভিভূত হইনি, বরং নৌকা ডুবে যাবে কি-না এই ভয়েই অস্থির হয়েছিলাম। কারণ নৌকা ছিল ফুটো, গলগল করে পাটাতন দিয়ে পানি ঢুকছিল। ভীত গলায় আমি বললাম, পানি ঢুকছে মামা।

'আরে থুও ফালাইয়া পানি, চান্নি কেমন হেইডা কও।'

'খুব সুন্দর।'

'খাইয়া ফেলতে মনে লয় না কও দেহি।'

জোছনা খেয়ে ফেলার তেমন কোন ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু তাকে খুশি করার জন্যে বললাম, হ্যাঁ। আলাউদ্দিন মহাখুশি হয়ে বলল, আও, তাইলে চান্নি পসর খাই। বলেই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলো খাওয়ার ভঙ্গি করতে লাগলো। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। আমি আমার একটি উপন্যাসে (অচিনপুর) এই দৃশ্য ব্যবহার করেছি। উপন্যাসের একটি চরিত্র নবু মামা জোছনা খেত।

আলাউদ্দিন যে একজন বিচিত্র মানুষ ছিল তা তার আশেপাশের কেউ ধরতে পারেনি। সে পরিচিত ছিল অকর্মা বেকুব হিসেবে। তার জোছনা-প্রীতিও অন্য কেউ লক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। তার ব্যাপারে সবাই আগ্রহী হল যখন সে এক শীতে গানের দলের সঙ্গে চলে গেল, এবং ফিরে এলো এক রূপবতী তরুণীকে নিয়ে। তরুণীর নাম দুলারী। তার রূপ চোখ-ঝলসানো রূপ।

নানাজী গম্ভীর গলায় বললেন, এই মেয়ে কে?

আলাউদ্দিন মাথা চুলকে বলল, বিবাহ করেছি মামুজী। বয়স হইছে। সংসার-ধর্ম করা লাগে। নবীজী সবেরে সংসার-ধর্ম করতে বলছেন।

'সেইটা বুঝলাম। কিন্তু এই মেয়ে কে?'

'হেইটা মামুজী এক বিরাট ইতিহাস।'

ইতিহাসটা শুনি।'

ইতিহাস শুনে নানাজান গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, এরে নিয়া বিদায় হ। আমার বাড়িতে জায়গা নাই।

আলাউদ্দিন স্টেশনের কাছে ছাপড়া ঘর তুলে বাস করতে লাগল। ট্রেনের টাইমে স্টেশনে চলে আসে, কুলিগিরি করে। ছোটখাট চুরিতেও সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। থানাওয়ালারা প্রায়ই তাকে ধরে নিয়ে যায়। তার বৌ নানাজানের কাছে ছুটে আসে। নানাজান বিরক্তমুখে তাকে ছাড়িয়ে আনতে যান। নিজের মনে গজগজ করেন — এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!

নানাজানকে যন্ত্রণা বেশিদিন সহ্য করতে হল না। আলাউদ্দিনের বৌ এক শীতে এসেছিল, আরেক শীতের আগেই মারা গেল। আলাউদ্দিন স্ত্রীর লাশ কবরে নামিয়ে নানাজানকে এসে কদমবুসি করে ক্ষীণ গলায় বলল, দাখিল হইলাম মামুজী।

বছর পাঁচেক পরের কথা। আমার দেশের বাইরে যাওয়া ঠিক হয়েছে। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে নানার বাড়ি গিয়ে দেখি, আলাউদ্দিনের অবস্থা খুব খারাপ। শরীর ভেঙে পড়েছে। মাথাও সম্ভবত খানিকটা খারাপ হয়েছে। দিন-রাত উঠোনে বসে পাটের দড়ি পাকায়। দড়ির সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলে। খুবই উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক কথাবার্তা। তার একটি চোখ আগেই নষ্ট ছিল। দ্বিতীয়টিতেও ছানি পড়েছে। কিছু দেখে বলে মনে হয় না। চোখে না দেখলেও সে চান্নি পসর সম্পর্কে এখনো খুব সজাগ। এক সন্ধ্যায় হাসিমুখে আমাকে বলল, ও ভাইগ্না ব্যাটা, আইজ যে পুরা চান্নি হেই খিয়াল আছে? চান্নি দেখতে যাবা না? যত পার দেইখ্যা লও। এই জিনিস বেহেশতেও পাইবা না।

সেই আমার আলাউদ্দিনের সঙ্গে শেষ চাঁদনি দেখতে যাওয়া। সে আমাকে মাইল তিনেক হাঁটিয়ে একটা বিলের কাছে নিয়ে এল। বিলের উপর চান্নি নাকি অপূর্ব জিনিস। আমাদের চান্নি দেখা হল না। আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। মেঘ কাটল না। এক সময় টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আলাউদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চান্নি আমরার ভাগ্যে নাই। ভাগ্য খুব বড় ব্যাপার ভাইগ্না ব্যাটা। ভাগ্যে না থাকলে হয় না।

আমরা ভিজতে ভিজতে ফিরছি। আলাউদ্দিন নিচু স্বরে কথা বলে যাচ্ছে, ভাগ্যবান মানুষ এই জীবনে একজন দেখছি। তোমার মামীর কথা বলতেছি। নাম ছিল দুলারী। তার মরণ হইল চান্নি পসর রাইতে। কি চান্নি যে নামল ভাইগ্না! না দেখলে বিশ্বাস করবা না। শইল্যের সব লোম দেহা যায় এমন পসর। চান্নি পসরে মরণ তো সহজে হয় না। বেশির ভাগ মানুষ মরে দিনে। বাকিগুলো মরে অমাবস্যায়। তোমার মামীর মত দুই-একজন ভাগ্যবতী মরে চান্নি পসরে। জানি না আল্লাপাক আমার কপালে কি রাখছে। চান্নি পসরে মরণের বড় ইচ্ছা।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর খবর আমি পাই আমেরিকায়। তার মরণ চাঁদনি পসরে হয়েছিল কি-না তা চিঠিতে লেখা ছিল না, থাকার কথাও নয়। কার কি যায় আসে তার মৃত্যুতে? সেই রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আমার স্ত্রীকে বললাম, গুলতেকিন, চল যাই জোছনা দেখে আসি। সে বিস্মিত হয়ে বলল, এই প্রচণ্ড শীতে জোছনা দেখবে মানে? তাছাড়া জোছনা আছে কি-না তাই-বা কে জানে।

আমি বললাম, থাকলে দেখব, না থাকলে চলে আসব।

গাড়ি নিয়ে বের হলাম। পেছনের সীটে বড় মেয়ে নোভাকে শুইয়ে দিয়েছি। সে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। মেয়ের মা বসেছে আমার পাশে। গাড়ি চলছে উল্কার বেগে। গুলতেকিন বলল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মন্টানার দিকে। মন্টানার জঙ্গলে জোছনা দেখব। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।

গাড়ির ক্যাসেট চালু করে দিয়েছি। গান হচ্ছে — আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। আমার কেন জানি মনে হল আলাউদ্দিন আমার কাছেই আছে। গাড়ির পেছনের সীটে আমার বড় মেয়ের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে সে আমার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে।

লালচুল

ভদ্রলোকের বয়স সত্তুরের মত।

মাথার চুল টকটকে লাল। মাথার লালচুলের জন্যেই হয়ত তাঁকে রাগী-রাগী দেখাচ্ছে। তাছাড়া কোমরের মাংসপেশীতে টান পড়ায় তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভঙ্গিটা অনেকটা সাপের ফণা তোলার মত। যেন এক্ষুনি ছোবল দেবেন। আমি বললাম, স্লামালিকুম।

তিনি বললেন, হুঁ।

সালামের উত্তরে সালাম দেয়াটাই প্রচলিত বিধি। তিনি হুঁ বলে এড়িয়ে গেলেন। তবে আপ্যায়ন বা শিষ্টতার কোন অভাব হল না। আমাকে হাত ধরে বসালেন। কাজের ছেলেকে চা দিতে বললেন।

আমার কাছে মনে হল ভদ্রলোক অসুস্থ। তাঁর মাথার চুল যেমন লাল চোখ দু'টিও লাল। খুব ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছেন। আমি এত দ্রুত কাউকে চোখের পাতা ফেলতে দেখিনি। বয়স বাড়লে মানুষ ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে কি-না তাও লক্ষ করিনি। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আমার চোখে সমস্যা আছে। চোখে অশ্রুগ্রন্থি বলে কিছু ব্যাপার আছে। সেখান থেকে জলীয় পদার্থ বের হয়ে সব সময় চোখ ভিজিয়ে রাখে। আমার ঐসব গ্রন্থি নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি বললাম, আপনার চুল এমন লাল কেন?

উনি বললেন, রঙ দিয়ে লাল করেছি। মেন্দী পাতা এবং কাঁচা হলুদের সঙ্গে সামান্য থানকুনি পাতা বেটে মিশিয়ে একটা পেস্টের মত তৈরি করে চুলে মাখলেই চুল এমন লাল হয়। আপনি যখন আমার মত বুড়ো হবেন, মাথার চুল সব পেকে যাবে, তখন মাথায় রঙ ব্যবহার করতে পারেন। মাথায় রঙ ব্যবহার করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ নয়। নবী-এ-করিমের হাদিস আছে। তিনি 'খেজাব' ব্যবহার করার পক্ষে মত দিয়েছেন। 'খেজাব' হচ্ছে এক ধরনের রঙ যা চুলে লাগানো হয়।

'ও আচ্ছা।'

'মাথাভর্তি সাদা চুল আমার পছন্দ না। সাদা চুল হল ওয়াইটএর লৈঅগ, যা মনে করিয়ে দেয় খেলা শেষ হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে নাও। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা শেষ প্রহর।'

'আপনি তৈরি হতে চাচ্ছেন না!'

'তৈরি তো হয়েই আছি। শাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে সবাইকে জানাতে চাচ্ছি না।'

ভদ্রলোকের বাড়ি প্রকাণ্ড। বেশির ভাগ প্রকাণ্ড বাড়ির মত এ বাড়িটিও খালি। তাঁর দুই মেয়ে। দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তারা স্বামীর সঙ্গে বাইরে থাকে। পত্নী বিয়োগ হয়েছে চার বছর আগে। এগারো কামরার বিশাল বাড়িতে ভদ্রলোক কিছু কাজের লোকজন নিয়ে থাকেন। পুরোপুরি নিঃসঙ্গ মানুষরা নানান ধরনের জটিলতায় ভুগেন। বিচিত্র সব কাজ কর্মে তাঁরা থাকতে চেষ্টা করেন। সঙ্গী হিসেবে এরা কখনোই খুব ভাল হয় না। কারণ তারাই সঙ্গী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করতে চায় না।

এই ভদ্রলোকও দেখলাম তার ব্যতিক্রম নন। তিনি দেখলাম, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছেন না। জায়গা বদল করছেন। এবং কিছুক্ষণ পরপর ঘরের ছাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। ভাবটা এ রকম যেন ঘরের ছাদটা কিছুক্ষণের মধ্যে ভেঙে তাঁর মাথায় পড়ে যাবে।

আমি যে কাজের জন্যে এসেছিলাম সেই কাজ সারলাম। ভদ্রলোকের ছোট মেয়ের স্বামীর ঠিকানা দরকার ছিল। তিনি ঠিকানা দিতে পারছেন না, তবে টেলিফোন নাম্বার দিলেন। আমি চা খেয়ে উঠতে যাচ্ছি, তিনি বললেন, আহা, বসুন না। বসুন। অল্পক্ষণ বসুন। গল্প করুন।

নিঃসঙ্গ একজন বৃদ্ধের অনুরোধ এড়ানো মুশকিল। আমি বসলাম, কিন্তু কি বলব ভেবে পেলাম না। এই বয়সের মানুষ কি ধরনের গল্প পছন্দ করে? পরকালের গল্প? ধর্ম? আমি জানি, একটা বিশেষ বয়সের পর মানুষজন ঘোর আস্তিক হয়ে যায়। কঠিনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করে। ধর্মের কথা শুনতে ভালবাসে। মৃত্যুতেই সব শেষ না — মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই তাদের জন্যে মৃত্যু নামক অমোঘ বিধান মেনে নিতে সাহায্য করে।

আমি বললাম, আপনি বলুন আমি শুনি। পরকাল সম্বন্ধে বলুন। মৃত্যুর পর কি হবে?

তিনি চোখ পিটপিট করে বললেন, মৃত্যুর পর কি হবে মানে? কিছুই হবে না। শরীর পঁচে-গলে যাবে। শরীরের যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস আছে — ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এরা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস-এর ক্ষয় নেই। কাজেই এদেরও ক্ষয় হবে না।

'আপনি কি ধর্ম-টর্ম বিশ্বাস করেন না?'

তিনি উত্তরে এমন সব কথা বলতে লাগলেন যা শুনলে ঘোর নাস্তিকরাও নড়েচড়ে বসবে এবং বলবে — বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল না। সালমান রুশদী তার কাছে কিছু না। একটু আগে যিনি নবীজীর পেজাব ব্যবহারের হাদিস দিলেন সেই তিনিই তাঁর সম্পর্কে এমন সব উক্তি করতে লাগলেন যা শুনলে নিরীহ টাইপের মুসলমানরাও চাকু হাতে তাঁর পায়ের রগ খুঁজতে বের হয়ে যাবে। এই আলোচনা আমার তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। আরবের মরুভূমির একজন নিরক্ষর ধর্মপ্রচারক হয়েও যিনি সেই সময়কার ভয়াবহ আইয়ামে জাহেলিয়াত লোকজনদের মন মানসিকতাই শুধু পরিবর্তন করেননি — সারা পৃথিবীতে এই ধর্মের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে তুচ্ছ করা ঠিক না। সমাজে অবিশ্বাসী তো থাকতেই পারে। অবিশ্বাসীদের যে কুৎসা ছড়াতে হবে তা তো না। আমি লক্ষ করেছি, অবিশ্বাসীরা কুৎসা ছড়ানো তাঁদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। বছর দু'-এক আগে যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে জনৈক আমেরিকান স্কলার (?)–এর একটি লেখা পড়েছিলাম, যাতে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, যীশু খ্রিস্ট ছিলেন একজন হমোসেকসুয়েল।

আমি লালচুল এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে যেতে পারতাম। ইচ্ছা করল না। তার চেয়েও বড় কথা, ধর্ম সম্পর্কে আমার পড়াশোনাও তেমন নেই। ভদ্রলোকের দেখলাম পড়াশোনা ব্যাপক। কোরান শরীফ থেকে মূল আরবী এবং সেখান থেকে সরাসরি ইংরেজী অনুবাদ যেভাবে স্মৃতি থেকে বের করতে লাগলেন তা আমার মত মানুষকে ভড়কে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার উঠা দরকার। উসখুস করছি। ভদ্রলোক যে উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছেন তাতে তাঁকে থামাতেও মন সায় দিচ্ছে না। তিনি এর মধ্যে চায়ের কথা বলেছেন। আমি তাতেও আগ্রহ বোধ করছি না। এ বাড়িতে কাজের মানুষ চা বানানো এখনো শিখেনি। আগের চা-টা দু' চুমুক দিয়ে রেখে দিয়েছি। নতুন চা এরচে' ভাল হবে এই আশা করা বৃথা। এমন সময় এক কাণ্ড হল, লালচুল ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বসুন। মাগরেবের নামাজের সময় হয়েছে। নামাজটা শেষ করে আসি। মাগরেবের নামাজের জন্যে নির্ধারিত সময় আবার অল্প। আমি মনে মনে বললাম — "হলি কাউ।"

ভদ্রলোক নামাজ পড়ার জন্যে সময় বেশি নিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, স্যরি, আপনাকে বসিয়ে রাখলাম। তাহলে আবার ডিসকাশন শুরু করা যাক — তিনি আবারো কথা বলা শুরু করলেন। কথার মূল বিষয় হচ্ছে — ধর্ম মানুষের তৈরি, আল্লাহ্ মানুষ তৈরি করেননি। মানুষই আল্লাহ্ তৈরি করেছে।

আমি বললাম, আপনি ঘোর নাস্তিক। কিন্তু একটু আগে নামাজ পড়তে দেখলাম। নামাজ পড়েন!

'হ্যাঁ পড়ি। গত পঁচিশ বছর যাবত পড়ছি। খুব কমই নামাজ কাজা হয়েছে।'

'রোজাও রাখেন?'

'অবশ্যই।'

'পঁচিশ বছর ধরে রাখছেন?'

'হবে, তবে দু'বার রাখতে পারিনি। একবার গল ব্ল্যাডারের জন্যে অপারেশন হল তখন, আরেক বার — হার্নিয়া অপারেশনের সময়। দু'টাই পড়ে গেল রমজান মাসে।'

'ঘোর নাস্তিক একজন মানুষ নামাজ-রোজা পড়ছেন এটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন কি ভাবে? আপনি তো মন থেকে কিছু বিশ্বাস করছেন না। অভ্যাসের মত করে যাচ্ছেন। তাই না-কি।'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। আমি বললাম, না-কি আপনার মনে সামান্যতম হলেও সংশয় আছে?

'না, আমার মনে কোন সংশয় নেই। আমার নামাজ-রোজার পেছনে একটি গল্প আছে। শুনতে চাইলে বলতে পারি।'

'বলুন।'

'আমি জজীয়তি করতাম। তখন আমি বরিশালের সেসান ও দায়রা জজ। আমি কঠিন প্রকৃতির মানুষ। খানিকটা বোধহয় নির্দয়। অপরাধ প্রমাণিত হলে কম শাস্তি দেবার মানসিকতা আমার ছিল না। অপরাধ করেছে, শাস্তি ভোগ করবে। এই আমার নীতি। দয়া যদি কেউ দেখাতে চায় তাহলে আল্লাহ্ বলে যদি কেউ থাকে সে দেখাবে। আল্লাহ্ দয়ালু। আমি দয়ালু না।

এই সময় আমার কোর্টে একটি মামলা এল। খুনের মামলা। সাত বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে খুন হয়েছে। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেছে, তারপর সে আর তার স্বামী মিলে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। জমিজমা নিয়ে শত্রুতার জের। সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই আছে। আমার মনটা খারাপ হল। শত্রুতা থাকতে পারে। তার জন্যে বাচ্চা একটা মেয়ে কেন প্রাণ হারাবে? মেয়েটার বাবা সাক্ষ্য দিতে এসে কাঁদতে কাঁদতে কাঠগড়াতেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

মামলা বেশিদিন চলল না। আমি মামলার রায় দেবার দিন ঠিক করলাম। যেদিন রায় হবে তার আগের রাতে রায় লিখলাম। সময় লাগল। হত্যা মামলার রায় খুব সাবধানে লিখতে হয়। এমনভাবে লিখতে হয় যেন আপিল হলে রায় না পাল্টায়। আমি মৃত্যুদণ্ড দেব, আপিলে তা খারিজ হয়ে যাবে, তা হয় না।

আমি স্বামীটিকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। তার স্ত্রীকেও মৃত্যুদণ্ড দেবার ইচ্ছা ছিল। এই মহিলাই বাচ্চা মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এসেছে। প্রধান অপরাধী সে। আইনের হাত সবার জন্যেই সমান হলেও মেয়েদের ব্যাপারে কিছু নমনীয় থাকে। আমি মহিলাকে দিলাম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

রায় লেখা শেষ হল রাত তিনটার দিকে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিজেই লেবুর সরবত বানিয়ে খেলাম। খুব ক্লান্ত ছিলাম। বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম। এমন গাঢ় নিদ্রা আমার এর আগে কখনো হয়নি।

আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের অংশটি মন দিয়ে শুনুন। স্বপ্নে দেখলাম, ৭/৮ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার নাম-টাম কিছুই বলল না। কিন্তু মেয়েটিকে দেখেই বুঝলাম — এ হল সেই মেয়ে যার হত্যার জন্যে আমি রায় লিখেছি। একজনের ফাঁসি এবং অন্যজনের যাবজ্জীবন। আমি বললাম, কি খুকী, ভাল আছ?

মেয়েটি বলল, হুঁ।

'কিছু বলবে খুকী?'

'হুঁ।'

'বল।'

মেয়েটি খুব স্পষ্ট করে বলল, আপনি ভুল বিচার করেছেন। এরা আমাকে মারে নি। মেরেছে আমার বাবা। বাবা দা দিয়ে কুপিয়ে আমাকে মেরে দা'টা ওদের খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখেছে। যাতে ওদেরকে মামলায় জড়ানো যায়। ওদের শাস্তি দেয়া যায়। আমাকে মেরে বাবা ওদের শাস্তি দিতে চায়।

'তুমি এসব কি বলছ? অন্যকে শাস্তি দেয়ার জন্য কেউ নিজের মেয়েকে মারবে?'

মেয়েটি জবাব দিল না। সে তার ফ্রকের কোণা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখলাম ভোর প্রায় হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আজান হল। আমি রান্নাঘরে ঢুকে নিজেই এক কাপ চা বানিয়ে খেলাম। স্বপ্নের ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। স্বপ্ন গুরুত্ব দেয়ার মত কোন বিষয় না। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এইসবই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। আমি মামলাটা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। স্বপ্ন হচ্ছে সেই চিন্তারই ফসল। আর কিছু না।

স্বপ্নের উপর নির্ভর করে বিচার চলে না।

রায় নিয়ে কোর্টে গেলাম। কোর্ট ভর্তি মানুষ। সবাই এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় শুনতে চায়।

রায় প্রায় পড়তেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ কি মনে হল — বলে বসলাম, এই মামলার

তদন্তে আমি সন্তুষ্ট নই। আবার তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি। কোর্টে বিরাট হৈচৈ হল। আমি কোর্ট এডজর্নড করে বাসায় চলে এলাম। আমার কিছু বদনামও হল। কেউ কেউ বলতে লাগল, আমি টাকা খেয়েছি। আমি নিজে আমার দুর্বলতার জন্যে মানসিকভাবে খানিকটা বিপর্যস্তও হলাম। আমার মত মানুষ স্বপ্নের মত অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার দ্বারা পরিচালিত হবে, তা হতে পারে না। আমার উচিত জজীয়তি ছেড়ে দিয়ে আলুর ব্যবসা করা।

যাই হোক, সেই মামলার পুনঃ তদন্ত হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটির বাবা নিজেই হত্যাপরাধ স্বীকার করল। এবং আদালতের কাছে শাস্তি প্রার্থনা করল। আমি তার ফাঁসির হুকুম দিলাম। বরিশাল সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি কার্যকর হল। ঘটনার পর আমার মধ্যে সংশয় ঢুকে গেল। তাহলে কি পরকাল বলে কিছু আছে? মৃত্যুর পর আরেকটি জগৎ আছে? ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা শুরু করলাম। নামাজ-রোযা আরম্ভ হল। আশা ছিল, এতে আমার সংশয় দূর হবে। যতই পড়ি ততই আমার সংশয় বাড়ে। ততই মনে হয় God is created by man. তারপর নামাজ পড়ি এবং প্রার্থনা করি — বলি, হে মহাশক্তি, তুমি আমার সংশয় দূর কর। কিন্তু এই সংশয় দূর হবার নয়।

'নয় কেন?'

কারণ আমাদের পবিত্র গ্রন্থেই আছে — সূরা বাকারার সপ্তম অধ্যায়ে বলা আছে —

> "Allah hath set a seal
> On their hearts and on their hearing
> And on their eyes is a veil."
>
> "আল্লাহ তাদের হৃদয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে ঢেকে দিয়েছেন,
> এবং টেনে দিয়েছেন চোখের উপর পর্দা।"

আমি তাদেরই একজন। আমার মুক্তি নেই।

ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমি বিদায় নেবার জন্যে উঠলাম। তিনি আমাকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আসছেন কেন? আপনি আসবেন না। তিনি মুখ কুঁচকে বললেন, আমাদের নবীজীর একটা হাদিস আছে। নবীজী বলেছেন — কোন অতিথি এলে তাঁকে বিদায়ের সময় বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিও।

এই বলেই তিনি বিড়বিড় করে নবী সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কিছু কথা বলে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সম্ভবত এশার নামাজের সময় হয়ে গেছে।